Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীজির বৈবাহিক জীবন

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোকসানা আক্তার

রোলঃ 228020642

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নবীজির বৈবাহিক জীবন

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

রোকসানা আক্তার

রোলঃ 228020642

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " নবীজির বৈবাহিক জীবন " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে রোকসানা আক্তার, আইডিঃ 228020642 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান
রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " নবীজির বৈবাহিক জীবন " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

রোকসানা আক্তার

আইডিঃ 228020642

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা:..5

*রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী গনের পরিচয়: 6

*উম্মাহাতুল মু'মিনীগনের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন ছিলেন:.......10

*রাসূল (সাঃ)স্ত্রীদের প্রতিদিন সময় দিতেন গল্প করতেন :..11

*স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে রাসূল (সাঃ)কুন্ঠাবোধ করতেন না :................................12

*স্ত্রীদের দ্বীনি শিক্ষা দিতেন :..14

*ইবাদতে সময় দেওয়ার পাশাপাশি স্ত্রীদের সময় দিতেন :..14

*স্ত্রীদের নিয়ে দাওয়াত কবুল করতেন :...15

*স্ত্রীদের আবেগ- অনুভূতির ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন : 15

*স্ত্রী অসুস্থ হলে রুকাইয়া করতেন :...16

*স্ত্রীর অনুপযুক্ত আচরণও সহ্য করতেন :...17

*সাংসারিক কাজে স্ত্রীদের সাহায্য করতেন :...17

*শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও সুবাসের ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন :.......................................18

*স্ত্রীদের বিনোদনের ব্যবস্থা করতেন :...18

*বেশি বেশি দান করতে উৎসাহ দিতেন :...20

*তাকওয়া, সচ্চরিএ, উদারতা, সহনশীলতা ও ক্ষমা করতে শেখাতেন........................21

*ঘরকে পাপ কাজ থেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে সজাগ থাকতেন :...................................21

*স্ত্রীদের ব্যাপারে নবীজির (সাঃ) গাইরাহ কাজ করত :...21

*স্ত্রীর ব্যাপারে কখনো মন্দ ধারণা রাখতেন না :...22

*স্ত্রীদের ঈর্ষার ব্যাপার গুলো প্রজ্ঞার সাথে সামলাতে :..23

*ইফকের ঘটনা : 24

*রাসূলের (সাঃ) স্ত্রীদের ভরণপোষন বাড়ানোর দাবি করার ঘটনা :...............................33

*নবীজির (সাঃ) বৈবাহিক জীবন নিয়ে যে সমালোচনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা : 35

*উপসংহার :..42

**তথ্যসূত্র :..42

ভূমিকা:

সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক এবং অফুরন্ত দরুদ ও শান্তি বর্ষিত হোক মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর উপর, তার পবিত্র পরিবারবর্গ এবং সাহাবীগনের উপর।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন একজন আদর্শ পুরুষ। যারা তাকে যত বেশি জেনেছেন তত বেশি ভালবেসেছেন।চৌদ্দশ বছর পরও যার প্রতি মুগ্ধতা এতটুকু কমেনি। রাসুলের জীবনের প্রতিটি পরতে ছড়িয়ে আছে আমাদের জন্য সাফল্য লাভের সকল নীতিমালা।

আল্লাহ প্রদত্ত একমাত্র জীবন বিধান ইসলামের প্রতিটি বিধি-বিধান অনুসরণের মাধ্যমে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক আদর্শ প্রতিষ্ঠা করে গেছেন যা সর্বকালের ও সর্বযুগের সব মানুষের জন্য অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় ।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

‘তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উওম আদর্শ রয়েছে যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহকে অধিক স্মরন করে’ (আল-আহযাব ৩৩:২১)

তাঁকে সর্বোত্তম চরিত্রাধিকারী বলেছেন স্বয়ং আল্লাহ তাআলা। আয়েশা রা. কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর চরিত্র কেমন ছিল? তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে ‘পবিত্র কুরআন কারীমই ছিল তার চরিত্র ‘। তাঁর জীবনীতে রয়েছে গোটা মানবতা, বিশেষত মুসলিম উম্মাহর জন্য উত্তমাদর্শ। সে কারণেই বিগত দেড় হাজার বছর ধরে গবেষণা ও পর্যালোচনা হয়ে আসছে তাঁর পবিত্র জীবনী নিয়ে। জীবনের নানাদিক ও কাজ নিয়ে।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর জীবন মানবজাতির জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ আদর্শ। তার (সাঃ) বৈবাহিক জীবন ও সেই আদর্শ জীবনেরই গুরুত্বপূর্ণ অংশ। যা পারিবারিক জীবনে শান্তি, ভালোবাসা, সহানুভূতি ও দায়িত্বশীলতার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তিনি (সাঃ) শিক্ষা দিয়েছেন স্ত্রীদের প্রতি সদয় হওয়া, দায়িত্ব নেওয়া ও সম্মান দেখানো। তিনি (সাঃ) বলেন- “ তোমাদের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর প্রতি উত্তম।আর আমি তোমাদের মধ্যে আমার স্ত্রীর প্রতি সবচেয়ে উত্তম।”

*রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর স্ত্রী গনের পরিচয়:

১.হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ)
২.হযরত সাওদা বিনতে যাম'আা (রাঃ)
৩.হযরত আয়িশাহ সিদ্দীকা বিনতে আবু বকর (রাঃ)
৪.হযরত হাফসা বিনতে উমার বিন খাত্তাব (রাঃ)
৫.হযরত যায়নাব বিনতে খুযাইমা (রাঃ)
৬.হযরত উম্মে সালমা (রাঃ)
৭.হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ)
৮.হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রাঃ)
৯.হযরত উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রাঃ)
১০.হযরত সাফিয়্যা বিনতে হুওয়াই বিন আখতাব (রাঃ)
১১.হযরত মায়মুনা বিনতে হারিস (রাঃ)

নবী করিম সাঃ এর এগারোজন স্ত্রীর দু'জন নবীজির জীবদ্দশায় ইন্তেকাল করেন এবং নয়জন স্ত্রী রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সময়ে জীবিত ছিলেন।

১.হযরত খাদিজা বিনতে খুওয়াইলিদ (রাঃ) :

হযরত খাদিজা (রা:) ছিলেন মক্কার বিখ্যাত, সম্ভ্রান্ত বংশের একজন নারী। খাদিজা (রাঃ) এর আগে ও বিয়ে হয়েছিল। খাদিজা (রাঃ) নিজস্ব ব্যবসায় ছিল, ব্যবসার কাজ সামলানোর জন্য তিনি বিভিন্ন লোক ভাড়া করতেন। নিজে কখনো ঘরের বাইরে ব্যবসা করতেন না।নবীজি (সাঃ) এর সততা ও সত্যবাদিতার কথা মক্কায় তখন ছড়িয়ে পড়েছে। তার কথা শুনে খাদিজা (রাঃ) তাঁকে ব্যবসার কাজে নিয়োজিত করলেন। ব্যবসার কাজ থেকে ফেরার পর নবীজির প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। খাদিজা (রাঃ) নবীজির অসাধারণ চরিত্রে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এবং বিয়ের প্রস্তাব পাঠালেন। রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রস্তাব মেনে নিয়ে বিয়ের জন্য সম্মতি দিলেন। নবীজি (সাঃ) এর বয়স তখন পঁচিশ আর খাদিজা (রাঃ) এর বয়স চল্লিশ। বয়সের এই ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও তাদের বৈবাহিক জীবনে কোন আচঁ ফেলতে পারেনি। খাদিজা (রাঃ) এর জীবদ্দশায় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম আর কোন বিয়ে করেননি।রাসূল (সাঃ) এর সন্তানাদির মধ্যে ইব্রাহিম ছাড়া সকলেই খাদিজা (রাঃ) এর গর্ভে জন্মগ্রহন করেন।

২.হযরত সাওদা বিনতে যাম'আ (রাঃ):

খাদিজা (রাঃ) এর মৃত্যুর পর নবুয়াতের দশম বর্ষে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাওদা (রাঃ) এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এর পূর্বে তিনি সাকরান বিন আমরের স্ত্রী ছিলেন। তার স্বামীর মৃত্যুর পর নবীজি (সাঃ) এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ইনি ৪৫ হিজরীতে মদিনায় মৃত্যুবরণ করেন।

৩.হযরত আয়িশাহ সিদ্দীকা বিনতে আবু বকর (রাঃ):

হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কন্যা হযরত আয়েশা (রাঃ)। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিওয়াসাল্লাম এর সাথে আয়িশা (রাঃ) বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন নবুয়াতের একাদশ বর্ষে। অর্থাৎ হিজরতের দুই বছর পাঁচ মাস পূর্বে। সে সময় আয়িশাহ (রাঃ) এর বয়স ছিল ছয় বছর। হিজরতের সাত মাস পর তিনি রাসূল (সাঃ) এর ঘরে যান। তখন আায়িশাহ (রাঃ) এর বয়স ছিল নয় বছর। আয়িশাহ রাঃ ছাড়া আর কোন অন্য স্ত্রীকে তিনি কুমারী অবস্থায় বিয়ে করেননি। তিনি রাসুল (সাঃ) এর সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন। এবং তিনি ছিলেন একজন আলিমা, প্রচন্ড মেধাশক্তির অধিকারী, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও অনুসন্ধানী প্রকৃতির। সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তার স্থান চতুর্থ। ইসলামের যে কোন ফিকহের গ্রন্থে আয়িশা (রাঃ) এর উল্লেখ পাওয়া যায়। নবীজি (সাঃ) এর সাথে আয়িশাহ (রাঃ) এর বিয়ে মুসলিম উম্মাহর জন্য অনেক বড় নেয়ামত। তিনি ৫৭ বা ৫৮ হিজরীতে মৃত্যুর বরণ করেন।

৪.হযরত হাফসা বিনতে উমার বিন খাত্তাব (রাঃ):

তিনি হযরত উমার (রাঃ) এর কন্যা ছিলেন। তিনি বিধবা ছিলেন। তার স্বামীর নাম ছিল হুযাফা (রাঃ)। তিনি বদর এবং উহুদ যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময় মৃত্যুবরণ করেন। তার মৃত্যুর পর তৃতীয় হিজরীর শাবান মাসে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

৫.হযরত যায়নাব বিনতে খুযায়মাহ (রাঃ):

তিনি মিসকীনদের প্রতি দয়াশীল, দানশীল ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। এজন্য তার পদবী হয়েছিল উম্মুল মাসাকীন (নিঃস্বদের জননী)। তার প্রথম স্বামী ছিল আব্দুল্লাহ বিন জাহাশ। তিনি ওহুদ যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেন। পরবর্তীতে তিনি চতুর্থ হিজরীতে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। মাত্র নয় মাস রাসুলের সঙ্গে সংসার জীবন যাত্রার পর চতুর্থ হিজরীতে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম তার সালাতে জানাযা পড়ান। এই বিয়ের পেছনে রাসুলুল্লাহর (সাঃ) উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক কল্যান।ইসলামে বহু বিবাহ চালু রাখার পেছনে এটি একটি প্রজ্ঞা।

৬.হযরত উম্মে সালামা (রাঃ):

তিনি আবু সালামা (রাঃ) এর স্ত্রী ছিলেন। সেখানে তার সন্তান-সন্ততি ছিল। আবু সালামা (রাঃ) মৃত্যুবরণ করলে সে বছরই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি ছিলেন সবচেয়ে বেশি পান্ডিত্যের অধিকারী এবং বুদ্ধিমতী নারী । এই বিয়ে ছিল স্বামী হারা উম্মে সালামার জন্য একটা আশ্রয়স্থল। এই বিয়ের মাধ্যমে রাসুলুল্লাহ (সাঃ) শিক্ষা দিচ্ছেন যেন আমরা আমাদের শহীদ ভাইদের পরিবারকে ভুলে না যাই।। তাদের দেখাশোনা করি, ও দায়িত্ব নেই। তিনি ৮৪ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন।

৭.হযরত যায়নাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) :

তিনি নবীজির ফুফাতো বোন ছিলেন। তিনি পূর্বে হযরত যায়েদ বিন হারিসা (রাঃ) এর স্ত্রী ছিলেন। যাকে নবীজির পুত্র মনে করা হতো।যায়েদ (রাঃ) এর সঙ্গে তার সদ্ভাব সৃষ্টি না হওয়ার কারণে তিনি তাকে তালাক দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে আল্লাহর নির্দেশে রাসুল সাঃ যায়নাব (রাঃ) কে বিয়ে করেন। এ সম্পর্কে সূরা আহযাবে কয়েকটি আয়াত অবতীর্ণ হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন "অতপর যায়েদ যখন যায়নাবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল,তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম। যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে বিবাহ করার ব্যাপারে

মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে।আর আল্লাহর নির্দেশ কার্যকরী হয়েই থাকে।"(সূরা-আহযাব ৩৩:৩৭)। এই বিষয়টা নিয়ে যায়নাব (রাঃ) খুব গর্ব করে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) অন্যান্য স্ত্রীদের বলতেন -"তোমাদের বিয়ে তো হয়েছে জমিনে আর আমার বিয়ে হয়েছে আসমানে।" এই বিয়ের মাধ্যমে একটি সামাজিক কু প্রথার পরিসমাপ্তি হয়েছে । যায়নাব রাঃ অত্যন্ত ইবাদত গুজারিনী ছিলেন। তিনি সবচেয়ে বেশি দান খয়রাত করতেন। তিনি ২০ হিজরীতে ৫৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

৮.হযরত জুওয়াইরিয়া বিনতে হারিসা (রাঃ):

জুওয়াইরিয়া রাঃ বনু মুস্তালিক গোত্রের সর্দার হারিসের কন্যা ছিলেন। তাকে মুসতালিক গোত্রের বন্দীদের সঙ্গে ধরে আনা হয়েছিল। পরবর্তীতে পঞ্চম বা ষষ্ঠ হিজরির শাবান মাসে রাসুল সাঃ এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এ বিয়ের ফলে বনু মুস্তালিকের সকল বন্দী মুক্তি লাভ করে। এবং তাদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর শ্বশুর বংশীয় বলা হয়।এই ঘটনার পর বনু মুস্তালিক গোত্র ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) ব্যক্তি জীবনে নেওয়া সিদ্ধান্তে পাল্টে যায় হাজারো মানুষের ভাগ্য।

৯.হযরত উম্মে হাবিবা বিনতে আবু সুফিয়ান (রাঃ):

তিনি প্রথম জীবনে উবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের স্ত্রী ছিলেন।এবং আবু সুফিয়ান রাদিয়াল্লাহু আনহু এর কন্যা ছিলেন। তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন এবং হাবসায় হিজরত করেন।সেখানে যাওয়ার পর তার স্বামী উবায়দুল্লাহ খ্রিস্টান হয়ে যান।কিন্তু হাবিবা (রাঃ) ইসলামের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। তার স্বামী মারা গেলে রাসূল (সাঃ) আমার ইবন উমাইয়া আদ দামরীর মাধ্যমে নাজ্জাশির কাছে একটি চিঠি লিখেন। এই পত্রে লিখা ছিল যে,নাজ্জাশি যেন নবীজির সাথে উম্মে হাবিবার বিয়ের ব্যবস্থা করেন।উম্মে হাবিবা রাঃ এর স্বীকৃতি গ্রহণের পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পক্ষ হতে চারশত দিনার মোহরানা প্রদান করে তার সঙ্গে বিয়ে সম্পন্ন করেন।

১০.হযরত সাফিয়্যা বিনতে হুওয়াই বিন আখতাব (রাঃ):

তিনি হচ্ছেন ইহুদি গোত্র বনু নাযিরের নেতা হুয়াই ইবন আখতাবের কন্যা। তার পূর্বের স্বামী ছিলেন বনু নাযিরের কোষাধ্যক্ষ কিনানা ইবন আর- রাবি।তিনি নেতৃস্থানীয় একটি পরিবারের মেয়ে ছিলেন । খাইবার যুদ্ধে তাঁর বাবা, ভাই এবং স্বামী মুসলিমদের হাতে মৃত্যুবরণ করেন। যুদ্ধে তাকে বন্দী করা হয়। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার কাছে ইসলামের বাণী পেশ করেন, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (সাঃ) তাকে আযাদ করে দেন। খায়বার বিজয়ের পর সপ্তম হিজরিতে বিয়ে করেন।

১১.হযরত মায়মুনা বিনতে হারিস (রাঃ):

তিনি ছিলেন আল- আব্বাস ইবন মুত্তালিবের স্ত্রী উম্মে ফাদলের বোন। তার আগের স্বামীর নাম আবু রুহম।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সপ্তম হিজরীতে যুল কদাহ মাসে কাযা ওমরা শেষ করার পর তার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। তিনি উম্মুল ফযল লুবাবা বিনতে হারিসের বোন ছিলেন। তিনি ৩৮ বা ৬৩ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন।

*উম্মাহাতুল মু'মিনীগনের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেমন ছিলেন:

উম্মাহাতুল মু'মিনীগনের সাথে রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত মধুর, শ্রদ্ধাপূর্ণ অত্যন্ত ভদ্রোচিত, সহৃদয়তা সম্পন্ন এবং সর্বোত্তম মর্যাদা বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত।

তিনি (সাঃ) তার স্ত্রীদের প্রতি খুবই দয়ালু ও সহনশীল ছিলেন। রাসূল(সাঃ) তাদের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। তাদের থেকে পরামর্শ নিতেন।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় উম্মে সালামা রাঃ পরামর্শ নেওয়ার ঘটনাটি এর অন্যতম। রাসূল (সাঃ) সারা জীবন কঠোর অভাব অনটন ও দারিদ্র্যের মধ্যে পার করেছেন। এমন অসচ্ছলতা সত্ত্বেও পবিত্র স্ত্রীগণ কখনোই কোন প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ

করেননি এবং এমন কোন কথা বলেননি বা কাজ ও করেননি যা রাসূল সাঃ এর মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। নবীজি (সাঃ) স্ত্রীদের সাথে আচরণে মহান হৃদয় ছিলেন।

*রাসূল (সাঃ)স্ত্রীদের প্রতিদিন সময় দিতেন গল্প করতেন :

ইবনে আব্বাস রাঃ থেকে বর্ণিত -”আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ফজরের সালাত শেষে তার জায়গায় বসে থাকতেন এবং সূর্য ওঠা পর্যন্ত লোকেরা তাকে ঘিরে থাকতো।সূর্য উঠলে তিনি সাঃ তার স্ত্রীদের কাছে গিয়ে একে একে সালাম দিয়ে দোয়া করতেন, এরপর তিনি সাঃ সে দিন যে স্ত্রীর ঘরে থাকার পালা থাকতো,তার ঘরে গিয়ে থাকতেন।

অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম   দিনের শুরুটা করতেন স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে, আবার আসরের সালাতের পরেও তিনি একে একে স্ত্রীদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং যে স্ত্রীর ঘরে থাকার পালা সেই স্ত্রীর ঘরে গিয়ে থাকতেন। রাসূল (সাঃ) এর স্ত্রীগন সব সময় নবীজিকে কাছে পেতেন এবং প্রতিদিনই রাসূল (সাঃ) এর দেখা পেতেন।

খেয়াল করে দেখা যায় নবীজি সাঃ প্রতিদিন সকালে এমনটা করতেন এবং আর এটিই থাকত তার (সাঃ) প্রথম কাজ।আার যেসব পুরুষরা দিনের পর দিন,রাতের পর রাত, মাসের পর মাস স্ত্রীদের সাথে দেখা করেনা, আবার কেউ কেউ প্রতিদিন বন্ধুর সাথে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় কাটায়,আবার কেউ খুব ভোরে ঘর থেকে বের হয়ে গভীর রাতে বাসায় ফেরে, তখন দেখা যায় তাদের পরিবারের সবাই ঘুমিয়ে গেছে আবার সেও ক্লান্ত থেকে ঘুমিয়ে পড়ে। বুঝা যায় তাদের স্ত্রীদের সাথে তাদের সম্পর্ক কেমন। তাদের জন্য রয়েছে রাসূলের জীবনের অনুপম আদর্শ ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রচুর ব্যস্ত থাকার পরও স্ত্রীদের সাথে গল্প করতেন একবার এক রাতে আইশা রাঃ নবীজি সাঃ কে উম্মে জারের গল্প বলছিলেন, একবার ১১ জন নারী একসাথে জড়ো হয়ে কোনো গোপনীয়তা ছাড়াই নিজ নিজ স্বামীর ব্যাপারে বলবে বলে শপথ নিল। তারপর প্রত্যেকেই তাদের স্বামী সম্পর্কে বলল।উম্মে জার তার স্বামীর অনুগ্রহ ও ভালবাসার বর্ণনা দেওয়ার

পর দেখা গেল, তাদের মধ্যে উম্মে জারের স্বামীই ছিল সর্বোত্তম। আয়িশা রাঃ বলেন -রাসূল (সাঃ) আমাকে বললেন "আমি তোমার কাছে তেমন, যেমনটা ছিল আবু জার উম্মে জারের কাছে"।

*স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে রাসূল (সাঃ)কুন্ঠাবোধ করতেন না :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশে কখনো লজ্জাবোধ করেননি। আয়িশা রাঃ এর প্রতি আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) ভালোবাসা ছিল সুস্পষ্ট।আমার ইবন আস রাঃ আল্লাহর রাসূলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন "মানুষের মধ্যে কে আপনার সবচেয়ে প্রিয়? নবীজি (সাঃ) বললেন, আয়িশা।তিনি (আমর) তখন জিজ্ঞেস করলেন পুরুষদের মধ্যে কে? তিনি বললেন, তার বাবা। (বুখারী,মুসলিম)।

নবীজি সাঃ আয়িশার রাঃ মতো কাউকে ভালোবাসেননি এবং তার প্রতি ভালোবাসা কখনোই লুকাতেন না। আয়িশা রাঃ পাত্রের যেখানে মুখ দিয়ে পান করতেন নবীজিও সেখানে মুখ দিয়ে দিয়ে পান করতেন এবং গোস্ত খাওয়ার সময় আয়েশা রাঃ যেখানে দাঁত লাগিয়ে ছিড়ঁতেন নবীজিও সেখানেই দাঁত লাগিয়ে ছিড়ঁতেন। (মুসলিম)। তিনি আদর করে স্ত্রীদের উপনামে ডাকতেন।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদিজা (রাঃ) সম্পর্কে বলেন-" তার প্রতি ভালোবাসা আল্লাহ নিজেই আমার হৃদয়ে গেঁথে দিয়েছেন"।

এখন বর্তমান সময়ে দেখা যায় অনেক ব্যক্তি তাদের স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করে না। এর প্রকাশকে বেমানান মনে করেন। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা প্রকাশ করলে বৈবাহিক জীবন সুন্দর ও সুখময় করা সম্ভব। স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসার কথা জানাবে, তাকে উপনামে ডাকবে এটি নারীদের প্রকৃতি। তারা এগুলো খুব পছন্দ করে। তাই একজন ভালো স্বামী হতে হলে সুন্নত অনুসরণ করা উচিত।

***খাদিজা (রাঃ) নাম বলার সময় তার প্রশংসা করতেন:**

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা খাদিজার (রাঃ) প্রশংসা করতেন। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত -"যখনই আল্লাহর রাসূল (সাঃ) খাদিজা রাঃ নাম উল্লেখ করতেন তার প্রশংসা করতেন প্রশংসা করা এবং আল্লাহর কাছে দুআ করার ব্যাপারে কখনোই তিনি যেন ক্লান্ত হতেন না"।

কিন্তু বর্তমানে দেখা যায় যে, ব্যক্তি তার প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর নতুন স্ত্রীকে বিয়ে করে এবং সে দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রশংসা করছে।বা তালাকের পর প্রথম স্ত্রীর দোষ গুলো বলে বেড়াচ্ছে। কিছু মানুষ স্ত্রী যতই ভালো হোক তার ভালো দিকগুলো কারো কাছে বলে না বরং খারাপ দিক নিয়েই বেশি আলোচনা করে। তাদের জন্য রাসূলের জীবন অনুপম আদর্শ।

***খাদিজা (রাঃ) কথা মনে পড়লে আনন্দিত হতেন:**

আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত-" একবার খাদিজার বোন হালা বিনতে খোওয়াইলিদ আল্লাহর রাসূলের ঘরে প্রবেশ করার অনুমতি চাইলেন, আর গলার স্বর খাদিজার কণ্ঠের অনুরূপ ছিল। রাসূলের সাঃ খাদিজা রাঃ কথা মনে পড়ল তিনি খুশিতে বলে উঠলেন 'হে আল্লাহ, এটা যেন হালা (খাদিজার বোন) হয় '।আমি ঈর্ষা অনুভব করলাম বললাম- আপনি কোরাইশের সেই বৃদ্ধা মহিলার কথা এখনো বলেন যার কিনা দাঁত পড়ে গিয়েছিল (বয়সের কারণে), অনেক আগেই যে কিনা মারা গিয়েছে, আর আল্লাহ আপনার জন্য উত্তম আরেকজন দিয়ে তাকে প্রতিস্থাপন করেছেন। তার মুখের অভিব্যক্তি অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে উঠল যা আমি তার মধ্যে কেবলমাত্র আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে দেখতে পেতাম। কিংবা তার উপর যখন ওহী আসতো।তিনি (সাঃ) বললেন- আল্লাহ আমাকে তার চেয়ে উত্তম কাউকে দিয়ে প্রতিস্থাপন করেননি।সে আমার উপর বিশ্বাস করেছিল, যখন লোকেরা আমাকে অবিশ্বাস করতো। সে আমাকে তার সম্পদ দিয়ে শক্তি যুগিয়েছিল, যখন লোকেরা আমাকে পরিত্যাগ করেছিল। তার মাধ্যমে আল্লাহ আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন। একথা শুনে আয়িশা (রাঃ) তাকে বললেন- যিনি আপনাকে সত্য বাণী সহ পাঠিয়েছেন তার কসম করে বলছি আজকের পর আমি তার প্রশংসা ছাড়া আর কোন কথা বলব না"।

***খাদিজার (রাঃ) বান্ধবীদের উপহার পাঠাতেন** :
আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত-" যখনই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ভেড়া কুরবানি করতেন মাংস কেটে টুকরো করার পর কিছু অংশ তার বান্ধবীদের কাছেও পাঠাতেন"।

*স্ত্রীদের দ্বীনি শিক্ষা দিতেন :

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদের দ্বীনি শিক্ষা দিতেন। তাদেরকে উপকারী দুআ শিক্ষা দিয়েছেন। রাসুল (সাঃ) তাদের সহজ কিন্তু সর্বোত্তম ইবাদতগুলো শেখাতেন। ইবাদতে নিজের উপর অত্যাচার করতে নিষেধ করতেন। অর্থাৎ ইবাদতের ব্যাপারে নিজের উপর কেউ যেন কঠোর না হয়।
পরিমাণে অল্প হলেও ইবাদত নিয়মিত জারি রাখতে উৎসাহ দিতেন। আয়েশা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন -" আল্লাহর কাছে সেই আমলগুলো প্রিয় যেগুলো নিয়মিত, তা পরিমাণে অল্প হোক না কেন"। স্ত্রীদের ইবাদত সম্পর্কে শেখাতেন। তিনি তাদেরকে মন্দের অনিষ্ট থেকে আশ্রয় গ্রহণ করতে শিখিয়েছেন।

*ইবাদতে সময় দেওয়ার পাশাপাশি স্ত্রীদের সময় দিতেন :

হযরত আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত-" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের দুই রাকাত সুন্নত সালাত পড়তেন, এরপর আমি জেগে থাকলে আমার সাথে কথা বলতেন , না হলে জামাআতের সময় হওয়া পর্যন্ত শুয়ে থাকতেন।"

*স্ত্রীদের নিয়ে দাওয়াত কবুল করতেন :

আনাস রাঃ হতে বর্ণিত- "আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) এক ফার্সি বংশোভূত প্রতিবেশী ছিল। সে ছিল স্যুপ তৈরিতে দক্ষ। সে আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) জন্য স্যুপ প্রস্তুত করে, তাকে আমন্ত্রণ জানাতে এল। তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন,-' আয়িশারও দাওয়াত আছে? 'সেও কি আমন্ত্রিত? সে বলল,' না'। তখন আল্লাহর রাসূল সাঃ বললেন তিনি আমন্ত্রণ কবুল করবেন না। সে আবার তাকে (সাঃ) আমন্ত্রণ জানাতে ফিরে এলো।আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন আয়িশাও কি আছে, সে ও কি আমন্ত্রিত? সে বলল, 'না'। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবার বললেন, তিনি আমন্ত্রণ কবুল করবেন না। লোকটি আবার তাঁকে (সাঃ) আমন্ত্রণ জানাতে ফিরে এল। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) আবার জিজ্ঞেস করলেন এখানে তো আয়িশাও আছে নাকি,তৃতীয় বারে লোকটি বলল 'হ্যাঁ'। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার আমন্ত্রণ কবুল করলেন, এবং আয়িশা রাঃ কে নিয়ে তার বাড়িতে গেলেন। "

ইমাম নববী রাহিমাহুল্লাহ বলেন- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশাকে ছাড়া একাই আমন্ত্রণে যাওয়া অপছন্দ করতেন।এবং এ থেকে দেখা যায় তিনি স্ত্রীদের প্রতি কতটা কোমল ছিলেন। এবং তাদের অধিকার কিভাবে রক্ষা করতেন। স্ত্রীদের সাথে সর্বোচ্চ মর্যাদার সাথে তিনি আচরণ করতেন।

*স্ত্রীদের আবেগ- অনুভূতির ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের মন ভালো না খারাপ সে বিষয়ে দৃষ্টি রাখতেন। রাসূল (সাঃ) আয়িশা রাঃ কে বলেন-" আমি খুব ভালোভাবে বুঝতে পারি কখন তুমি আমার উপর খুশি থাক, আর কখন মন খারাপ করে থাক। আয়েশা (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কিভাবে বুঝতে পারেন, তিনি (সাঃ) উত্তর দিলেন, "যখন তুমি সন্তুষ্ট থাকো, তখন শপথের সময় বল মোহাম্মদের রবের কসম, আর যখন মন খারাপ করো তখন বল ইব্রাহিমের রবের কসম"। আয়িশা রাঃ বলেন,' হ্যাঁ

আপনি ঠিক ধরেছেন’ আল্লাহর রাসূল সেক্ষেত্রে শুধু আপনার নাম উচ্চারণ করা থেকেই বিরত থাকি।’ এত এত দায়িত্বের মাঝে থেকেও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের খোঁজ নিতে ভুলতেন না। তাদের অনুভূতির ব্যাপারে মনোযোগী ছিলেন।

রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ভালোবাসার আরেকটি উদাহরণ সাফিয়্যার (রাঃ) উটের ঘটনা। সাফিয়্যা (রাঃ) হতে বর্ণিত -নবীজি (সাঃ) একবার হজের সফরে তার স্ত্রীদের নিয়ে বের হলেন। সফরের এক পর্যায়ে চালক উটের গতি বাড়িয়ে দিল। নবীজি (সাঃ) তাকে বললেন-” ভঙ্গুর পাত্রগুলো (নারীরা) আছে, সাবধান! একবার আমার উট অসুস্থতার কারণে হাটু গেড়ে বসে পড়ল। আমি কাঁদতে লাগলাম। সংবাদ পেয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহিস ওয়াসাল্লাম চলে এলেন। আমার চোখের পানি তাঁর হাত দিয়ে মুছে দিলেন”। সাফিয়্যার (রাঃ) কান্নার কারণ তেমন বড় কিছু ছিল না।কিন্তু রাসূল (সাঃ) সাধারণ এ তুচ্ছ বিষয়টিকে তুচ্ছ হিসেবে না দেখে বরং তিনি (সাঃ) নিজ হাতে চোখের পানি মুছে দিয়ে ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ করলেন।

*স্ত্রী অসুস্থ হলে রুকাইয়া করতেন :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্ত্রীদের কেউ অসুস্থ হলে তাদের দেখতে যেতেন এবং তাদের রুকাইয়া করতেন।

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত-”স্ত্রীদের কেউ অসুস্থ হলে নবীজি সাঃ তাকে দেখতে যেতেন এবং তার ওপর ডান হাত রেখে রুকাইয়া অর্থাৎ নিদিষ্ট দুআ ও কুরআনের আয়াত পড়তেন।

অনেক স্বামী এমন রয়েছে যারা স্ত্রীদের শারীরিক, মানসিক ব্যাপারে কোন খোঁজ খবর রাখে না, বরং স্ত্রী অসুস্থ হলে বিরক্তি প্রকাশ করে। কিন্তু স্বামীদের উচিত এ সময় স্ত্রীদের পাশে থাকা।তাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা, তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া। যাতে করে স্ত্রীরা বুঝতে পারে স্বামী তার নিরাপদ আশ্রয়স্থল। আবু হুরায়রা রাঃ থেকে বর্ণিত- রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন -”হে আল্লাহ আপনি সাক্ষী আমি এতিম

ও মহিলা- এই দুই শ্রেণীর অধিকার এবং এর সংক্রান্ত আহকাম সম্পর্কে মানুষকে জানিয়ে দিয়েছি।”

*স্ত্রীর অনুপযুক্ত আচরণও সহ্য করতেন :

নোমান ইবনে আল- বশির থেকে বর্ণিত আবু বকর রাঃ আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) ঘরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন এসময় বাইরে থেকে তিনি শুনতে পেলেন আয়িশা (রাঃ) রাসুলুল্লাহর (সাঃ) এর সাথে উঁচু গলায় কথা বলছে। ঘরে প্রবেশের অনুমতি পেয়ে তিনি আয়েশাকে (রাঃ) কিছুটা রাগান্বিত হয়ে নিজের দিকে টেনে বললেন- ‘তোমার সাহস কত! আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) সাথে উঁচু গলায় কথা বলো!’আল্লাহর রাসূল তাকে রক্ষা করার জন্য তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেলেন। আবু বকর চলে গেলে রাসূলুল্লাহ তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন, “দেখলে কিভাবে তোমাদের সাথে তোমাদের মাঝে এসে তোমাকে রক্ষা করলাম”। আবু বকর ফিরে এসে তাদের দুজনকে হাস্যোজ্জ্বল দেখলেন। আবু বকর বললেন, হে আল্লাহর রাসুল আপনাদের যুদ্ধে যেমন শরিক হয়েছিলাম, আপনাদের খুশিতে ও তেমনি আমাকে শরিক করুন। “

*সাংসারিক কাজে স্ত্রীদের সাহায্য করতেন :

এক বর্ণনায় এসেছে -”নবীজি (সাঃ) নিজের জামা নিজে ধুতেন, নিজের জুতা নিজেই মেরামত করতেন।” আরেক বর্ণনায় আছে- “নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো একজন মানুষই ছিলেন যিনি নিজেই নিজের কাপড় সেলাই করতেন, ভেড়ার দুধ দোহাতেন। পুরুষরা বাসায় সচরাচর যেসব কাজ করে সেগুলো করতেন”। কিন্তু বর্তমানে পুরুষদের মধ্যে লক্ষণীয় যে, তারা আরো উল্টো তাদের স্ত্রীদেরকে সাহায্যের বদলে কাজের চাপ বাড়িয়ে দেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাজ নিজে করতেন। যিনি কিনা পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, আল্লাহর প্রেরিত রাসুল।

*শারীরিক পরিচ্ছন্নতা ও সুবাসের ব্যাপারে খেয়াল রাখতেন :

আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বাসায় ফিরে মিসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতেন। যেন তার মুখ থেকে দুর্গন্ধ না পায়।

সূরায় ইবনে হানী রহিমাহুল্লাহ থেকে বর্ণিত আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন-" বাসায় ঢুকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রথম কোন কাজ করতেন?" তিনি উত্তরে বললেন, "মিসওয়াক দিয়ে দাঁত পরিষ্কার করতেন"।

সূয়তী রাহিমাহুল্লাহ বলেন," তার এরকম অভ্যাসের পেছনে কারণ ছিল সারাদিন বাইরে কথা বলে তার মুখের গন্ধ বদলে যেত, স্ত্রীদের সাথে সুন্দরতম ব্যবহারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতটাই যত্নবান ছিলেন যে সামান্যতম দুর্গন্ধ না রাখার ব্যাপারেও তিনি খেয়াল রাখতেন। রসুন, পেঁয়াজ হালাল হওয়া সত্বেও তা পরিহার করে চলতেন, কারণ তা মুখে দুর্গন্ধ সৃষ্টি করে।"

আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত- "নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনে বা রাতে যখনই ঘুমাতেন, ঘুম থেকে উঠে প্রথমে মিসওয়াক করতেন তারপর ওজু করতেন।"

ইবনে কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন, "রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিসওয়াক ব্যবহার করতে পছন্দ করতেন। ঘুম থেকে উঠে, অজুর পূর্বে, সালাতের শুরুতে এবং বাসায় প্রবেশের পর মিসওয়াক করতেন। মিসওয়াকের জন্য তিনি আরাক গাছের ডাল ব্যবহার করতেন"। রাসূলুল্লাহ সব সময় সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। নবীজির অন্যতম গুন ছিল সুগন্ধি ব্যবহার করা। আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত- "নিজের শরীর থেকে দুর্গন্ধ বের হোক এটি নবীজি পছন্দ করতেন না।"

*স্ত্রীদের বিনোদনের ব্যবস্থা করতেন :

আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত-" একদিন আল্লাহর রাসূল আমার সঙ্গে বসে ছিলেন। এমন সময় বেশ কিছু উচ্চ কণ্ঠে আওয়াজ শুনতে পেয়ে দেখতে গেলেন কি হচ্ছে। তিনি দেখলেন কিছু আবিসিনীয় বালক বল্লম দিয়ে খেলা করছে।তিনি আমাকে বলেন, "আয়িশা, তুমি আসবে তাদের খেলা দেখতে?" আমি উঠে গিয়ে তার কাঁধে

থুতনি রেখে খেলা দেখতে লাগলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার দেখা শেষ হলো? তার কাছে আমার অবস্থা দেখার জন্য (কতক্ষণ এভাবে থাকেন) প্রত্যেকবার আমি 'না' বলতে লাগলাম।''

ইবনে বাত্তান রাহ. বলেন- নবীজি কতটা মহান চরিত্রের ছিলেন তা এ ঘটনা প্রমাণ করে এবং প্রত্যেকের উচিত হারাম না হলে স্ত্রীর খুশিকে নিজের জন্য কষ্টকর হলেও প্রাধান্য দেওয়া।

ইবনে রজব রাহ. বলেন- রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ঈদ ও বিয়ে উপলক্ষে তাঁর স্ত্রীদের বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার না করে কবিতা আবৃত্তি করে আনন্দ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তবে দফ নামক বাদ্যযন্ত্রে ছাড় রয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়িশা (রাঃ) এর সাথে দুইবার দৌড় প্রতিযোগীতা করেছিলেন। প্রথমবার আয়িশা রাঃ জিতেছিলেন।পরেরবার প্রতিযোগীতায় রাসূল (সাঃ) জিতে বলেছিলেন "এটা আগেরটার শোধ"।

নবীজি অল্প বয়সী মেয়েদের সাথে আয়িশাকে রাঃ খেলার অনুমতি দিয়েছিলেন। আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত-''আমি নবীজি সাঃ এর উপস্থিতিতে পুতুল খেলতাম এবং অনেক সময় আমার বান্ধবীরাও আমার সাথে খেলত। আল্লাহর রাসূল আমার ঘরে ঢুকলে তারা লুকিয়ে পড়তো। আল্লাহর রাসূল তাদেরকে আমার সাথে খেলা করার জন্য ডাক দিতেন।''

পারিবারিক বন্ধনকে আরো আনন্দঘন করার জন্য নবীজি (সাঃ) মজা করতেন। এক হাদীসে এসেছে আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত-'' সাওদা বিনতে যামআ একদিন আমাদের ঘরে আসলেন। আল্লাহর রাসূল সাঃ আমার ও তার মাঝে বসে এক পা আমার কোলে আর একটা পা তার কোলের উপর রাখলেন। আমি সাওদার জন্য হারিনা (মসুর, ছোলা এবং ধনে দিয়ে বানানো এক ধরনের স্যুপ) রান্না করছিলাম। আমি তাকে বললাম 'খান' কিন্তু তিনি খেতে চাইলেন না। আমি বললাম,আল্লাহর কসম আপনি খাবেন, না হলে আমি আপনার মুখে ঢেলে দেব। এরপরও তিনি খেতে চাইলেন না। আমি তখন তার মুখে এর কিছুটা ঢেলে দিলাম। রাসুল (সাঃ) হাসতে শুরু করলেন এবং উরু দিয়ে সাওদাকে রক্ষা করার চেষ্টা করতে করতে তাকে বললেন, 'ওর মুখে ও ঢেলে দাও' তিনি তাই করলেন। তিনি আবার হাসতে শুরু করলেন। আমরা বাইরে উমার কে বলতে শুনলাম, আব্দুল্লাহ

ইবনে উমার! আব্দুল্লাহ ইবনে উমার! আল্লাহ'র রাসুল তখন আমাদের বললেন উঠো উঠো তোমাদের মুখ পরিষ্কার করো। আমার মনে হয় উমার এখন আসবে"। এখান থেকে উপলব্ধি করা যায় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের সাথে কেমন আনন্দঘন মুহূর্ত কাটিয়েছেন।

*বেশি বেশি দান করতে উৎসাহ দিতেন :

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রীদের বেশি বেশি দান করতে উৎসাহ দিয়েছেন। আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন- "নিজেকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করো একটি খেজুরের অর্ধেক দান করে হলেও।"

একবার ভেড়া কুরবানীর সময় নবীজি সাঃ তার স্ত্রীদের উদার হাতে দান করতে শিক্ষা দিয়েছেন।আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত- " একবার আমরা একটি ভেড়া জবাই করলাম এবং সেখান থেকে দান করলাম।পরে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, ' কতখানি বাকি আছে'? আমি বললাম, কাঁধের মাংস ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। তিনি বলেন, 'বরং বলো,কাঁধের মাংস ছাড়া বাকি সবটুকুই আছে।" মোবারকপুরী (রাহ.) বলেন এর দ্বারা তিনি বুঝিয়েছেন, "আমরা যা দান করবো সেগুলো আমাদের জন্য থেকে যাবে (পুরষ্কার হিসেবে)। আর যা নিজের জন্য রেখে দেওয়া হল, তা তো চলে গেল (সেগুলোর কোন প্রতিদান পাওয়া যাবে না)। বুখারী ও মুসলিমের একটি হাদিসে রয়েছে, আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত- রাসুলুল্লাহ (সাঃ) বলেন- "তোমাদের মাঝে সবার আগে আমার সাথে তার দেখা হবে, যার লম্বা হাত রয়েছে। অর্থাৎ যিনি অনেক দান করেন। আয়িশা (রাঃ) বলেন - 'তখন আমরা আমাদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে মাপতে গিয়ে দেখলাম, সব থেকে লম্বা হাত সাওদার, কিন্তু হাদীসের মতে লম্বা হাত ছিল যায়নাবের। কারণ নিজ হাতে জিনিস তৈরি করত ও বিক্রি করতো। এবং সে অর্থ দান করত।"

ইবনে হাজর রাহ. বলেন- "এই রেওয়ায়েত দ্বারা বুঝা যায় আমাদের উচিত যত সম্ভব বেশি বেশি দান করা। তাহলে আমরা নবীজির সাথে জান্নাতে দেখা করতে পারব"।

*তাকওয়া, সচ্চরিত্র, উদারতা, সহনশীলতা ও ক্ষমা করতে শেখাতেন

আয়িশা রাঃ থেকে বর্ণিত- "একবার নবীজি (সাঃ) তাকে বললেন- আয়িশা আল্লাহর ব্যাপারে সচেতন থাকো এবং দয়ার আচরণ করবে। কারণ দয়া যখন কোন কিছুতে যুক্ত হয় তখন তা সেটিকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে। আর কোন কিছুতে দয়া না থাকলে তা বিকৃত ও ত্রুটিপূর্ণ হয়ে যায়।"
আরেকটি হাদিসে এসেছে আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত- নবীজি সাঃ বলেছেন - "আয়িশা সবসময় মানুষকে দয়া করো আল্লাহ যখন কোন ঘরের মঙ্গল চান তিনি তার মাঝে দয়ার প্রসার করে দেন।"

*ঘরকে পাপ কাজ থেকে মুক্ত রাখার ব্যাপারে সজাগ থাকতেন :

ঘরে যেন কোন ধরনের পাপ কাজ না হয় সেদিকে রাসুল (সাঃ) সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।যদিও তাঁর (সাঃ) ঘরে পাপ কাজ হওয়ার কোন সম্ভাবনা ছিল না বললেই চলে। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত- "নবীজি (সাঃ) আমার ঘরে ঢুকে দেখলেন পশুর ছবি সংবলিত পর্দা ঝুলানো, তাঁর চেহারা রাগে লাল হয়ে গেল।তিনি সাথে সাথে পর্দা টেনে ছিড়েঁ টুকরো টুকরো করে ফেলে বললেন,যারা এরকম চিত্রাঙ্কন করে, তারা কিয়ামতের দিন কঠিন তম শাস্তি পাবে "।
ছোট ছোট পাপের ব্যাপারেও স্ত্রীদের সাবধান করতেন। আয়িশা রাঃ হতে বর্ণিত- রাসূলুল্লাহ (সাঃ)বলেন -"আয়িশা সগিরা গুনাহের ব্যাপারে সাবধান থাকো। আল্লাহ সেগুলো লিখে রাখার জন্য একজন ফেরেশতা নিয়োগ করে রেখেছেন"।

*স্ত্রীদের ব্যাপারে নবীজির (সাঃ) গাইরাহ কাজ করত :

নবীজি এমন কাউকে নিজ স্ত্রীদের সাথে দেখা করতে দিতেন না যারা তাদের মাহারাম না বা নারীদের বর্ণনা অন্যদের কাছে বলে বেড়াতে পারে বা জানে। এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর গাইরাহ কাজ করতো।যা সব

মুসলিমের জন্যই অনুসরণীয়। কিন্তু বর্তমানে লক্ষ্য করা যায় যে,অনেক মুসলিম ইসলামের এই বিধান লংঘন করে এবং তাদের স্ত্রীদের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়ায়।যা সমাজ ও অন্যান্যদের মাঝে গাইরাহকে হালকা করে দিচ্ছে।

*স্ত্রীর ব্যাপারে কখনো মন্দ ধারণা রাখতেন না :

আনাস রাঃ হতে বর্ণিত- "নবীজি (সাঃ) সফর থেকে ফিরলে তার স্ত্রীদের সাথে দেখা করতেন না।এ ক্ষেত্রে সকাল কিংবা সূর্যাস্তের পরই শুধু তিনি সাঃ ঘরে ঢুকতেন।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত- "নবীজি সাঃ নিষেধ করেছেন যে,কেউ যেন গোপনে বাসায় ফিরে না আসে,সন্দেহ না করে এবং তারা কি করছে তা যেন লুকিয়ে না দেখে, তাদের দোষ যেন খুঁজে না বেড়ায়।"

দীর্ঘ সফর শেষে হঠাৎ না জানিয়ে বাসায় আসা উচিত নয়।কম সময়ের জন্য থাকলে বা বাসায় ফেরার সময় আগে থেকে জানা থাকলে রাতে ঘরে ফিরতে সমস্যা নেই।

ইবনে হাজর রাহিমাহুল্লাহ বলেন- "এই হাদিস স্বামী- স্ত্রীর মাজে সহানুভূতি ও ভালবাসার উদ্রেক করে। যদিও তারা একে অপরের খুঁটিনাটি দোষগুলো সম্পর্কে ভালো করেই জানে। তারপরও আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন যেন গোপনে রাতে বাসায় না ফেরে। না হলে হয়তো সে স্ত্রীকে এমন কোন অবস্থায় দেখে ফেলতে পারে যা তার পছন্দর নাও হতে পারে"।

জাবির ইবনে আব্দুল্লাহ রাঃ হতে বর্ণিত - "নবীজি বলেন -তোমাদের মধ্যে কেউ রাতে সফর থেকে ফিরে এলে সাথে সাথে স্ত্রীর সাথে যেন দেখা না করে, বরং তাকে যেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়ার সুযোগ দেয় এবং এলোমেলো চুল সাজানোর সময় দেয়"।

ইবনে হাজর (রাহ.) বলেন -"যে লোক সকালে কাজ করতে বেরিয়ে যায় রাতে বাসায় ফিরে আসে তার অবস্থা নিশ্চয়ই তার থেকে আলাদা যে লম্বা সফরে বের হয় এবং হঠাৎ ফিরে আসে। প্রথম ক্ষেত্রে স্ত্রী জানে অমুক সময়ে সে ফিরে আসবে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে স্ত্রীর কাছে তা অজানা। হাদীসে দ্বিতীয় পরিস্থিতির কথা বলা হচ্ছে।

এভাবে হঠাৎ ফিরে এলে স্ত্রীকে অপরিচ্ছন্ন ও অগোছালোভাবে দেখে স্বামীর ভালো নাও লাগতে পারে।যা তাদের মাঝে বিরক্তি ও অসন্তোষ এর উদ্রেক করবে।"

*স্ত্রীদের ঈর্ষার ব্যাপার গুলো প্রজ্ঞার সাথে সামলাতে :

নবীজি সাঃ বলেন -"আল্লাহ নারীদের তাকদীরে ঈর্ষা লিখে রেখেছেন"
অর্থাৎ নারীদের মাঝে প্রকৃতভাবেই ঈর্ষা তৈরি করে রেখেছেন।
রাসূলের (সাঃ) অন্যান্য স্ত্রীদের তুলনায় আয়িশা (রাঃ) এর বিশেষ মর্যাদা রাসূলের (সাঃ) কাছে ছিল এবং আয়িশা (রাঃ) এ বিষয়টি ভালো করে জানা সত্ত্বেও অন্য স্ত্রীদের ঈর্ষা করতেন, এমনকি তিনি রাসূলের (সাঃ) মৃত স্ত্রীর ব্যাপারেও ঈর্ষাবোধ করতেন এবং বলতেন -'আমি কাউকে এতটা ঈর্ষা করতাম না যতটা খাদিজাকে করতাম'।
রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈর্ষার ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া দেখাতেন না।
আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত -নবীজি (সাঃ) এক স্ত্রীর (আয়িশা) ঘরে ছিলেন। তখন অন্য এক উম্মুল মুমিনীন (স্ত্রী) এক পাত্রে করে তার জন্য খাবার পাঠালেন। যে স্ত্রীর ঘরে নবীজি (সাঃ) ছিলেন,তিনি (ঈর্ষাবশত) তার হাত দাসের হাতে ধাক্কা দিলেন, এতে পাত্র ভেঙ্গে গেল। নবীজি (সাঃ) ভাঙ্গা টুকরোগুলো কুড়িয়ে নিয়ে তাতে পড়ে যাওয়া খাবারগুলো তুলতে লাগলেন। আর হাসতে হাসতে বললেন,তোমাদের মা (আমার স্ত্রী) ঈর্ষা করেছে।এরপর তিনি খাদেমকে থামালেন এবং যে স্ত্রীর ঘরে ছিলেন তার থেকে একটি পাত্র নিয়ে, যে স্ত্রীর পাত্র ভেঙ্গে গিয়েছে তাকে ফেরত দেওয়ার জন্য ভাঙা পাত্রের অংশগুলো সে বাসাতেই রেখে দিলেন"।
ইবনে হাজর (রাহ.) বলেন- "এই ঘটনা মহিলাদের ঈর্ষার ব্যাপারে আমাদের ক্ষমা করার শিক্ষা দেয়। কারণ, তারা ঈর্ষার কারণে রেগে গিয়ে এরকম কাজ করে বসে"।
এখান থেকে উপলব্ধি করা যায় যে নবীজি (সাঃ) স্ত্রীদের প্রতি কেমন উদার ও সহনশীল ছিলেন।

*ইফকের ঘটনা :

ইফকের ঘটনা আয়িশা (রাঃ) এর জীবনে একটি দুঃখজনক ঘটনা। এটি একটি কঠিন পরীক্ষা ছিল আয়িশার (রাঃ) জন্য। বনু মিসতালিক্ব থেকে ফেরার পথে এ ঘটনাটি ঘটে।

আয়িশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন - "রাসুলুল্লাহ (সাঃ) সফরে রওয়ানা দেওয়ার আগে আমাদের নামে লটারি করতেন। যার নাম লটারিতে উঠতো, তিনি তাকে নিয়ে যাত্রা করতেন। বনু মুস্তালিকের অভিযানের সময়েও লটারি হলো। সেবার লটারিতে আমার নাম উঠলো। তিনি আমাকে সাথে নিয়ে চললেন। তখন হিজাবের আয়াত নাযিল হয়ে গেছে। সফরের সময়টায় আমি তাই একটা পালকির ভেতর বসে থাকতাম। ছোট্ট বাক্সের মত একটা জিনিস। সেটাকে উটের পিঠে রাখা হতো। আর আমি তার ভেতর বসে থাকতাম। আশেপাশের লোকেরাই একে উটের পিঠে উঠিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে দিত। এরপর মাথায় রশি টেনে উটকে চালানো শুরু হতো।

সেবার সফর শেষে মদিনায় ফিরে আসছি, এমন সময় রাসূলুল্লাহ (সাঃ) যাত্রা বিরতি নিলেন। ঠিক হলো রাতের কিছু সময় এখানে কাটানো হবে। এরপর যখন আবার যাত্রা করার সময় হলো, আমার প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার প্রয়োজন পড়লো। সবাই তৈরি হয়ে নিচ্ছে, এর মাঝেই আমি বাইরে বেরোলাম। সে সময় আমার গলায় ছিল জাফর পাথরের একটা হার। কিন্তু ফিরে এসে গলায় হাত দিয়ে দেখি হারটি নেই। কখন গলা থেকে পড়ে গেল কিছুই টের পাইনি। হার খুঁজতে আবারো ফিরে গেলাম। যেয়ে দেখি ওখানেই হারটা পড়ে আছে।

ওদিকে সবাই ততক্ষণে মদীনার পথে যাত্রা শুরু করেছে। যারা আমার উট চালানোর দায়িত্বে ছিল, তারা আমাকে নেওয়ার জন্য এসেছিল, পালকিটিও উটের পিঠে চড়িয়েছিল। আমি যে পালকির মধ্যে নেই এটা ওরা বুঝতে পারল না। আসলে সে সময়ে মহিলারা হালকা পাতলা ছিলেন। যতটুকু না খেলেই নয় ততটুকুই খেতেন, এর বেশি না। আর আমার বয়সও তখন কম ছিল। ওরা ভেবেছিল আমি নিশ্চয়ই পালকির ভেতরে আছি। সবাই আমাকে রেখেই রওনা দিয়ে দিল।

সেনাশিবিরে পৌঁছে দেখি সেখানে কেউ নেই। কিন্তু আমি জানতাম, তারা যখন আমাকে পাবে না, তখন আমার খোঁজে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে। বসে বসে থাকতে চোখের পাতা ভারী হয়ে এল, কখন যেন ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকাল হয়ে এল।আমি যেখানে শুয়ে ছিলাম সেখানে এলেন সাফওয়ান ইবন আল-মুআত্তিল আস- সুলামী। উনি মুজাহিদ এর থেকে পেছনে ছিলেন, সম্ভবত কারো ফেলে যাওয়া জিনিস কুড়িয়ে নিতে পিছিয়ে পড়েছিলেন। তিনি দূর থেকে কালো মতন কিছু একটা দেখেই বুঝেছিলেন কেউ শুয়ে আছে। কাছে আসার পর আমার অবয়ব দেখে আমাকে চিনে ফেললেন। কারণ হিজাবের আয়াত নাযিল হওয়ার আগে তিনি আমাকে দেখেছিলেন। আমাকে দেখে বলে উঠলেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন!

আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।উঠেই সাথে সাথে আমার মুখ ঢেকে ফেললাম। আল্লাহর কসম, তিনি আমার সাথে আর একটা কথাও বলেননি, আমিও চুপ করেছিলাম। একটা উট এনে তিনি সেটাকে আমার সামনে বসালেন। আমি উটের পিঠে চড়লাম, আর উনি উটের মাথা ধরে টানতে টানতে দ্রুত কাফেলার দিকে এগিয়ে চললেন।

সময়টা মধ্য দুপুর। ভরদুপুরের প্রচন্ড গরমে সবাই বিশ্রাম নিচ্ছে। এমন একটা সময় উনি আমাকে উটের পিঠে চড়িয়ে নিয়ে সেখানে হাজির হলেন। এ দৃশ্য দেখে যা হওয়ার হয়ে গেছে। কিছু লোক আমার আর সাফওয়ান এর ব্যাপারে কুৎসা রটিয়ে দিল। মুসলিমদের মাঝে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হল।

মদীনায় মানুষের মুখে মুখে সেই একই গল্প। আর সবকিছুর পিছে মূল হোতা হলো আবদুল্লাহ ইবন উবাই। আমি কিন্তু এসবের কিছুই জানিনা। মদীনায় পৌঁছেই আমি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ি। প্রায় একমাস বিছানা ছেড়ে উঠতে পারিনি। বাইরে কী কথাবার্তা হচ্ছে কোনো ধারনাই নেই। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আর আমার পরিবারের কান পর্যন্ত কাহিনী ঠিকই পৌঁছালো। কেউই আমাকে কিছুই বললো না। কিন্তু আমি লক্ষ্য করলাম আমার প্রতি নবীজির আচরণ কেমন যেন

বদলে গেছে, ঠিক আগের মত আর নেই। এমনিতে আমি কখনো অসুস্থ হয়ে পড়লে তিনি খুব আদর- যত্ন করতেন। কিন্তু এবার তেমনটা করলেন না। শুধু ঘরে আসতেন, সালাম দিতেন আর বলতেন, কেমন আছো?- ব্যাস, এইটুকুই। এর পরই চলে যেতেন। আমার মন বলছিল, কী যেন একটা সমস্যা আছে।
ভেতরে ভেতরে আমার খুব কষ্ট হচ্ছিল। আল্লাহর রাসূলের এমন নিলিপ্ত আচরণ একেবারে মেনে নিতে পারছিলাম না। একদিন বললাম, আপনি অনুমতি দিলে আমি মায়ের কাছে যেতে চাই। তিনিই আমার দেখাশুনা করুক। তিনি বললেন,যেতে পারো। কোন বাধা নেই। আমি তখন মায়ের কাছে চলে গেলাম। তখনও কিন্তু কি হচ্ছে তার কিছুই জানিনা।

প্রায় তিন সপ্তাহ রোগে ভুগে শুকিয়ে এতোটুকু হয়ে গেছি। সে সময় আরবদের মাঝে বিদেশীদের মতো ঘরের ভেতর পেশাবখানা ছিল না। ওগুলো আমরা খুব অপছন্দ করতাম। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার দরকার হলে বাইরে বেরিয়ে মদীনার খোলা জায়গাগুলো ব্যবহার করতাম। তেমনি এক রাতে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতে বের হয়েছি উম্মু- মিসতাহকে নিয়ে। সে ছিল আবু রুহম ইবন আব্দ- মানাফের মেয়ে। আমরা দুজন আল- মাসানাই এর দিকে চলছি। হঠাৎ সে কাপড় বেঁধে আছাড় খেয়ে পড়লো, আর ফট করেই তার মুখ দিয়ে ছেলের নামে অভিশাপ বেরিয়ে এল, ওরে মিসতাহ,তুই শেষ হয়ে যা! আমি বললাম, কী বলছো এসব! যে মানুষটা বদরে অংশ নিয়েছে,তাকে তুমি অভিশাপ দিচ্ছ? সে বললো, তুমি কি জানো না তোমার ব্যাপারে ও কী বলেছে? আমি জানতে চাইলাম। উম্মু মিসতাহ তখন আমাকে সমস্ত কাহিনী খুলে বললো।

ওয়াল্লাহি! আমার তখন এত বেশি খারাপ লাগছিল যে, আমি কিছুই করতে পারলাম না। প্রাকৃতিক প্রয়োজন না সেরেই ঘরে ফিরে এলাম। অনেক কাদঁলাম আমি। কাঁদতে কাঁদতে মনে হচ্ছিল কলিজাটা ফেটে যাবে। মাকে গিয়ে বললাম, আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুক। লোকেরা যা বলার তা তো বলেছে। তুমি কেন আমাকে কিছুই জানালে না? ওরা আমার নামে এসব কি বলছে মা? মা বললেন, এমনটাই

হয়রে মা। একজন সুন্দরী নারী যখন স্বামীর ভালোবাসা পায় তখন বাকি স্ত্রীরা তার দোষ খুঁজে বেড়াবেই। তুই দুশ্চিন্তা করিস না।

মানুষ আমার নামে এসব কী বলছে? আমি সারারাত কাঁদলাম। সকাল পর্যন্ত কেদেঁই গেলাম, কেদেঁই গেলাম। সকাল হয়ে গেল। চোখ বেয়ে অঝোর ধারা বইছে। সারারাত এক ফোঁটাও ঘুমাতে পারিনি।

সবচেয়ে বেশি কুৎসা রটিয়েছে আব্দুল্লাহ ইবন উবাই। সাথে ছিল খাযরাজ গোত্রের কিছু লোক, মিসতাহ,আর জাহশের মেয়ে হামনাহ। হামনার এসব কথা ছড়ানোর কারণ ছিল। সে ছিল উম্মুল মুমিনীন যাইনাবের আপন বোন। নবীজির (সাঃ) বাকি স্ত্রীদের মাঝে এই এক যাইনাবই (রাঃ) আমার সাথে প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারতেন। অথচ যাইনাব আমার নামে একটা খারাপ কথাও বলেননি। কিন্তু হামনা তার বোনের পক্ষ নিতে গিয়ে আমার নামে এমন বাজে কথা ছড়ালো যে আমি খুবই কষ্ট পেলাম।

আমার ব্যাপারে ওয়াহী আসতে দেরি হচ্ছিল। নবীজি (সাঃ) আলী (রাঃ) উসামাহ ইবন যাইদের (রাঃ) সাথে আমার ব্যাপারে পরামর্শ করলেন। উসামাহ বললেন, আমরা তো তাঁর ব্যাপারে ভালো ছাড়া খারাপ কিছু কখনো শুনিনি। আলী বললেন, আল্লাহ তো আপনার জন্য বিষয়টা কঠিন করেননি। আরো কত মহিলা আছে। আপনি বরং তার সেবিকা বারীরার সাথে কথা বলে দেখুন, সে আপনাকে আয়েশার ব্যাপারে সত্য জানাতে পারবে।

নবীজি (সাঃ) বারীরাকে ডেকে জানতে চাইলেন আমার মধ্যে সে সন্দেহজনক কিছু দেখেছে কিনা। বারীরা বললো, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য সহকারে পাঠিয়েছেন, কমতি বলতে আমি তার মধ্যে শুধু এইটুকু গাফেলতি দেখেছি যে, ময়দার কাই বানিয়ে সে মাঝে মাঝে ঘুমিয়ে পড়ে,আার ছাগল এসে সেগুলো খেয়ে নেয়।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) উঠে দাঁড়ালেন সবাইকে ডেকে বললেন, আব্দুল্লাহ ইবন উবাইকে শায়েস্তা করার ব্যাপারে তোমাদের কি কিছু বলার আছে? এই লোক আমার পরিবারকে নিয়ে মিথ্যা কথা ছড়িয়েছে। আমার পরিবার সম্পর্কে আমি ভালো ছাড়া খারাপ কিছু জানি না। আর তারা এমন একজন লোকের (সাফওয়ান) অভিযোগ এনেছে যার সম্পর্কে আমি ভালো বাদে কিছু জানিনা। আমি না থাকলে এ কোনদিন আমার ঘরে ঢুকেনি।

সাদ ইবন মুআয বললেন, আপনি তার সাথে যা খুশি করুন, আমার কোন আপত্তি নেই। সে যদি আওস গোত্রের হয়ে থাকে তাহলে আমরাই তার গর্দান আলাদা করে দেবো। আর যদি সে খাযরাজ গোত্রের হয়ে থাকে,তাহলে আপনি আমাদের যা আদেশ দেবেন আমরা তা-ই করব।

খাযরাজের নেতা সা'দ ইবন উবাদা উঠে দাঁড়ালেন। এর আগে সবাই তাকে ভালোই জানতো। কিন্তু এই মুহূর্তে একটা অদ্ভুত গোত্রীও চেতনা তাকে পেয়ে বসল। তিনি বলে উঠলেন, মিথ্যে বলছো তুমি! তুমি তাকে এভাবে হত্যা করতে পারো না।সে মুরোদও তোমার নেই।তোমার নিজ গোত্রের হলেও তুমি এই কাজ করতে পারো না।

এই কথা শুনে সাদ ইবন মুয়াযের ভাই উসাইদ ইবন হুদাইর রেগে গেলেন। সাদ ইবন উবাদাকে বললেন, আরে ব্যাটা মিথ্যা তো তুই নিজে বলছিস।তুই নিজে একটা মুনাফিক।এখন এসে আর এক মুনাফিকের পক্ষ নিচ্ছিস! আমরা ঐ ব্যাটাকে মারবোই মারবো।

চেতনার উন্মাদনায় দুই গোত্রের মারামারি লেগে যাওয়া উপক্রম। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তখন মিম্বরে বসা। তিনি দু’পক্ষকে শান্ত করলেন, নিজেও শান্ত হলেন।

আর আমি! সেদিন সারাটা দিন শুধুই কাঁদলাম। এক মুহূর্তের জন্যেও ঘুমাতে পারলাম না। দুই রাত একদিন টানা কেঁদেই গেলাম। আমার বাবা-মা আমার পাশে

এসে বসলেন। তাদের মনে হলো আমার বুক ফেটে কলিজাটা বুঝি বের হয়ে আসে। এক আনসারি মহিলা আমার ঘরে এলো। আমি কাঁদছিলাম আমার সাথে সেও কাঁদতে শুরু করল।

এমন সময় নবীজি (সাঃ) এলেন। আমার পাশে এসে বসলেন। এই ঘটনার পর এই প্রথম তিনি আমার পাশে বসলেন। আমাকে বললেন শুনো, আয়িশা, তোমার ব্যাপারে আমি এই এই কথা শুনেছি। তুমি যদি নির্দোষ হয়ে থাকো, তাহলে আল্লাহ তোমাকে নির্দোষ প্রমাণ করবেন। আর যদি কোন পাপ করে থাকো তাহলে আল্লাহর কাছে তওবা কর। যখন বান্দা আল্লাহর কাছে তার দোষ স্বীকার করে তখন তিনি বান্দার তওবা কবুল করেন।

এ কথা শুনে আমার চোখের পানি শুকিয়ে গেল। আমার আশা ছিল বাবা- মা আমার হয়ে রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) অন্তত কিছু একটা বলবেন।কিন্তু তারাও চুপ, কারো মুখে কোন রা নেই। বাবা -মাকে বললাম,আমার হয়ে তোমরা আল্লাহর রাসূলকে কিছু তো বলো! তারা বললেন,জানিনা কী বলবো। বলার মতো ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না.. বাবা- মা'র নীরবতা দেখে আমি আবার কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

- আমার বয়স তখন অনেক কম। খুব বেশি কুরআন ও আমি পড়িনি। কিন্তু সেই আমিই তখন আল্লাহর রাসূলকে বললাম, আল্লাহর শপথ! যে গুনাহর কথা আপনি বলছেন তার জন্য আমি কখনো আল্লাহর কাছে তাওবা করবো না। মানুষ যা বলছে, তা যদি আমি স্বীকার করি, তাহলে এমন কিছু কে স্বীকার করে নেওয়া হবে যা কখনো ঘটেনি। আর যে কথা আমার ব্যাপারে বলা হচ্ছে, সে কথা আপনি এতবার শুনেছেন যে এটা আপনার অন্তরে গেথেঁ আছে। আপনি মানুষের কথাই বিশ্বাস করে ফেলেছেন। এখন যাই বলি না কেন আপনি আমাকে বিশ্বাস করবেন না। আর আমি যদি বলি আমি দোষ করেছি সেটা আপনি ঠিকই বিশ্বাস করে ফেলবেন। কিন্তু আল্লাহ জানেন আমি নির্দোষ। আমার তো শুধু একটা কথাই মনে পড়ছে, যে কথা নবী ইয়াকুব তাঁর ছেলেদের বলেছিলেন,

“এবং তারা তার জামায় কৃত্তিম রক্ত লাগিয়ে আনলো। বললেন, এটা কখনই নয় ;বরং তোমাদের মন তোমাদেরকে একটা কথা সাজিয়ে দিয়েছে। সুতরাং এখন সবর করাই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছো, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্য স্থল “-(সূরা ইউসুফ, ১২:১৮)

এই বলে আমি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লাম। আমি নিশ্চিত জানতাম আল্লাহ অবশ্যই আমার পবিত্রতা প্রমাণ করবেন। কিন্তু আল্লাহর কসম, কখনো ভাবতেও পারিনি যে, আল্লাহ আমার জন্য কুরআনের আয়াত নাযিল করে ফেলবেন আর সেই আয়াত মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত পাঠ করে যাবে! নিজেকে আমার খুব নগণ্য মনে হয়। কোরআনের আয়াতে উল্লেখ হবার মতো যোগ্য কখনোই মনে হয়নি। আমার আশা ছিল নবীজি (সাঃ) হয়তো স্বপ্নে কিছু দেখতে পাবেন, যার দ্বারা আল্লাহ আমার পবিত্রতা প্রমাণ করবেন এবং কিছু তথ্য দেবেন।

ওয়াল্লাহি! নবীজি তার আসন ছেড়ে ওঠেননি। তার আগেই আল্লাহ আয়াত নাযিল করতে শুরু করলেন। তাঁকে তাঁর চাদর দিয়ে মুড়ে দেওয়া হলো। তাঁর মাথার নিচে একটা চামড়ার বালিশ রাখা হলো। আর আমি যখন আমার চোখের সামনে এগুলো দেখছিলাম, ওয়াল্লাহি, তখন আমার ভেতর কোনো উৎকণ্ঠা, ভয় কিছুই নেই। আমি জানতাম আমি পবিত্র। আমি জানতাম আল্লাহ আমার ক্ষতি করবেন না। আল্লাহর শপথ, যে মহান রবের হাতে আয়িশার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, যখন নবীজির (সাঃ) ওপর আয়াত নাযিল হওয়া শেষ হলো, আমার বাবা-মায়ের ততক্ষনে মরার হাল! লোকেরা যা বলাবলি করছে, তা যদি ওয়াহীর মাধ্যমে সত্য প্রমান হয়ে যায়!

কিন্তু ওয়াহী নাযিল শেষ হবার পর আল্লাহর রাসূলের (সাঃ) প্রথম কথাটি ছিল ও আয়িশা তোমার জন্য সুসংবাদ। আল্লাহ তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করে আয়াত নাযিল করেছেন! মা বললেন, যাও তোমার স্বামীর কাছে যাও। আমি বললাম, আমি যাবো না। আমি কেবল আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করব।

নবীজি (সাঃ) কুরআনের আয়াতগুলো লোকেদের কাছে পড়ে শোনাতে বেরিয়ে গেলেন। মিসতাহ,হাসসান ইবন সাবিত আর হামনার উপর শাস্তি কার্যকর করলেন। কারণ তারা ছিল অপবাদ রটনাকারীদের মধ্যে অন্যতম। আল্লাহ যে আয়াতগুলো নাযিল করলেন সেগুলো হলো,
“যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু আছে যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করোনি এবং বলোনি যে, এটা তো নির্জলা অপবাদ? তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? অতঃপর যখন তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। যদি ইহকালে ও পরকালে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো তবে তোমরা যা চর্চা করছিলে,তজ্জন্যে তোমাদের গুরুতর আযাব স্পর্শ করতো। যখন তোমরা একে মুখে মুখে ছড়াচ্ছিলে এবং মুখে এমন বিষয় উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা একে তুচ্ছ মনে করছিলে, অথচ এটা আল্লাহর কাছে গুরুতর ব্যাপার ছিল। তোমরা যখন এ কথা শুনলে তখন কেন বললেনা যে, এ বিষয়ে কথা বলা আমাদের উচিত নয়? আল্লাহ তো পবিত্র, মহান। এটাতো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনো এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। আল্লাহ তোমাদের জন্য কাজের কথা স্পষ্ট করে বর্ণনা করেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না। যদি তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকতো এবং আল্লাহ দয়ালু, মেহেরবান না হতেন তবে কত কিছুই হয়ে যেত”। (সূরা নূর,২৪:১১-২০)
এটি সহীহ বুখারী মুসলিম এবং সিরাতে ইবনে হিসামে বর্ণিত ইফকের ঘটনা।

*ইফক্কের এই ঘটনার মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার স্ত্রী সাথে কেমন আচরণ করেছেন,তা থেকে আমরা অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি :

১.নবীজি (সাঃ) তার স্ত্রীর ব্যাপারে তড়িগড়ি করে কোন সিদ্ধান্ত নেননি বরং অভিযোগ গ্রহণের আগে সে ব্যাপারে তদন্ত করেছেন। পুরো একমাস সময় নিয়ে তিনি সবশেষে আয়িশার (রাঃ) সাথে কথা বলেছেন।
তাই আমাদেরও উচিত কোন সিদ্ধান্তে আগে নিয়ে যাচাই-বাছাই করা ও কথা বলা।

২.নবীজি (সাঃ) আয়িশার (রাঃ) সাথে আচরণে পরিবর্তন এনেছিলেন। যেহেতু তখনও দোষ প্রমাণিত হয়নি, তাই তিনি (সাঃ) আয়িশার (রাঃ)   সাথে কম দেখা করতেন, কম খোঁজ নিতেন। আবার একেবারে তাঁকে ছেড়েও যাননি।
ইবনে হাজর (রাহ.) বলেন- "এ ঘটনা থেকে আমরা শিখতে পারি, স্বামীর উচিত স্ত্রীর সাথে কোমল ভাবে আচরণ করা এবং নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্তে না পৌঁছা। আবার স্ত্রীকে ইঙ্গিতে বোঝানো যে কিছু একটা সমস্যা হয়েছে যেন স্ত্রী তার সমস্যা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে এবং দোষ বুঝতে পেরে স্বীকার করে।"

৩.রাসুলুল্লাহ (সাঃ) অতি গোপনীয় ভাবে আয়িশার (রাঃ) ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়েছেন। খুব কাছ থেকে রাসুলের সাথে ওঠাবসা করতেন এমন মানুষজনকে জিজ্ঞেস করেছিলেন।
ইবনে হাজর (রাহ.) বলেন- "তিনি (সাঃ) এ ব্যক্তিদের জিজ্ঞাসা করার পেছনে কারণ ছিল। আলী (রাঃ) তার বাসায় বড় হয়েছেন এবং পরে ফাতেমার সাথে বিয়ের পর তার পরিবারের সাথে সম্পর্ক আরো গভীর হয়েছে। উসামা রাঃ ও নবীজির (সাঃ) খুব কাছ থেকে মিশতেন এবং তাঁর অন্যতম প্রিয় সাহাবী ছিলেন। এছাড়াও তারা দুজনে তরুণ সাহাবী ছিলেন। তাই তারা সঠিক কথা বলার ব্যাপারেও বেশি তৎপর থাকবেন। এমনটি স্বাভাবিক। এটি বয়স্কদের ক্ষেত্রে হয় না। কারণ তারা কথা বলার আগে অনেক ভাবনা চিন্তা করেন। এবং তারা যা জানেন তা নাও বলতে পারেন"।

নারীদের মধ্যে নবীজি দুজনকে জিজ্ঞাসা করেছেন, যারা কিনা আয়িশা রাঃ কে কাছ থেকে দেখত।
তদন্ত কাজে ব্যক্তি নির্বাচনে নবীজির (সাঃ) এই পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ। এতে করে আয়িশা (রাঃ) সম্মান ও অক্ষুন্ন রইলো।
ওহী পাঠাতে দেরী করার মাধ্যমে আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছেন। যাতে করে কঠিন পরিস্থিতিতে কিভাবে কাজ করা উচিত এবং যাতে করে পারিবারিক সমতা রক্ষা হয় ও বন্ধন অটুট থাকে।

৪.রাসুল (সাঃ) উত্থাপিত অভিযোগের বিষয়ে আয়িশা (রাঃ) কে সরাসরি জিজ্ঞেস করেছিলেন। যাতে করে সত্য প্রকাশিত হয়ে যায় এবং অন্তরগুলো প্রশান্তি লাভ করে। এভাবেই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আয়েশাকে (রাঃ) সামলিয়ে ছিলেন।

৫.সত্য যখন প্রকাশিত হয়ে গেল তখন আয়িশার (রাঃ) মা তাকে বললেন- “রাসুলুল্লাহর (সাঃ) কাছে যাও (কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর)। তিনি উত্তর দিলেন,না, আল্লাহর কসম, আমি তার নিকট যাব না। আল্লাহ ব্যতীত আর কারো প্রশংসাও করবো না।”
নববী (রাহ.) বলেন - “ইফকের এই ঘটনা থেকে আয়িশার (রাঃ) পবিত্রতা কোরআন দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে এবং অধিকাংশ আলিমের ঐক্যমত অনুসারে তার পবিত্রতার ব্যাপারে সন্দেহ করলে অবিশ্বাসী ও মুরতাদ হয়ে যাবে।”

*রাসূলের (সাঃ) স্ত্রীদের ভরণপোষন বাড়ানোর দাবি করার ঘটনা :

এ ঘটনা নবম হিজরী। একবার এমন হয়েছিল স্ত্রীদের সাথে অভিমান করে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) এক মাস বাড়ির বাইরের কাটান। পুরো সময় তিনি তার কোন স্ত্রীর কাছে যাননি।

একদিন আবু বকর রাঃ রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন আরো অনেকেই রাসুলের ঘরের দরজায় অপেক্ষমান। কাউকে ভেতরে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। আবু বকর রাঃ ভেতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেওয়া হল। এরপর উমার রাঃ এলেন তাকে অনুমতি দেওয়া হলো। আল্লাহর রাসূল (সাঃ) নিচে বসে আছেন আর চারপাশ ক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে ওনার স্ত্রীরা। সবার মধ্যে বিষাদের ছাপ। পুরো পরিবেশ থমথমে হয়ে আছে। গুমোট ভাবটাকে হালকা করার জন্য উমার রাঃ মজা করে বললেন, ' ইয়া রাসুলুল্লাহ' আমার টাকা পয়সা নেই জেনেও যদি আমার বউ তার পেছনে খরচ করার জন্য আমাকে পীড়াপীড়ি করতো,তাহলে আমি তার ঘাড় ভেঙে দিতাম! উমারের কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) হেসে দিলেন, বললেন, 'এখানেও তা-ই হয়েছে! আমার চারপাশে যাদের দেখতে পাচ্ছ তারাও আমার কাছে ধন-সম্পদ চাইতে শুরু করেছে!'

একথা শুনেই আবু বকর রাঃ নিজ কন্যা আয়িশা (রাঃ) দিকে এগিয়ে গেলেন আর উমার (রাঃ) এগিয়ে গেলেন নিজ কন্যা হাফসার (রাঃ) দিকে। দুজনেই আল্লাহর রাসূলের দুই স্ত্রীর বাবা! উমার রাঃ বললেন, 'তোমরা নবীজির কাছে এমন কিছু দাবি করছো, যা তার কাছে নেই! 'তারা উত্তর দিলেন আমরা কখনো এমন কিছু দাবি করবো না যা আল্লাহর রাসূলের কাছে নেই।'এই ঘটনা কে কেন্দ্র করে রাসুল স্ত্রীদের থেকে একমাস আলাদা ছিলেন। আর সেই সময় আল্লাহ তায়ালা কোরআনে এই আয়াত নাযিল করেন।

"হে নবী! আপনি আপনার স্ত্রীদের বলে দিন তোমরা যদি পার্থিব জীবনের ভোগ ও এর বিলাসিতা কামনা করো, তাহলে এসো আমি তোমাদের ভোগ- বিলাসের ব্যবস্থা করে দিই এবং সৌজন্যের সাথে তোমাদের বিদায় করি। আর যদি তোমরা আল্লাহ,তার রাসূল ও পরকালকে কামনা করো তাহলে তোমাদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল, আল্লাহ তাদের জন্য মহা প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।"(সূরা আহযাব, ৩৩:২৮-২৯)

এ আয়াতের নির্দেশ বাস্তবায়ন করতে রাসুল (সাঃ)আয়িশাকে (রাঃ) দিয়ে শুরু করলেন- আয়িশা (রাঃ) বললেন যে, তিনি আল্লাহ, তার রাসূল ও আখিরাতকে

বেছে নিয়েছেন এবং রাসূলের অন্যান্য স্ত্রীদের একই ব্যাপারে বলা হলে তারাও আয়িশার (রাঃ) এর মত উত্তর দিয়েছেন।

এ ঘটনা থেকে আমরা শিক্ষা পাই, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিবারে অর্থনৈতিক সমস্যা গুলো কিভাবে সমাধান করেছেন এবং স্ত্রীদের সাথে সমস্যা হলে কিভাবে সমাধান করেছেন। সমস্যাট শুরুতে কথা না বাড়িয়ে বরং চুপ ছিলেন। তিনি তাদেরকে দুটি সুযোগ দিয়েছিলেন হয় তারা তার সাথে থাকবে যেভাবে আছে সেভাবে নতুবা, তারা চাইলে তাকে ছেড়ে চলে যেতে পারেন।

ইসলামী শরীয়ত শেখায় যে -স্ত্রী যদি স্বামীর সাধ্যের অতিরিক্ত ভরণ পোষণ দাবি করে, তাহলে স্বামী তাকে তার সাথে থাকার বা তাকে ছেড়ে যাওয়ার সুযোগ দিতে পারেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তার স্ত্রীদেরকে সতর্কতার সাথে ধীরেসুস্থে চিন্তাভাবনা করতে বলেছেন।

বৈবাহিক জীবন সুন্দর করতে প্রত্যেকের জন্যই রাসুলের জীবনে রয়েছে অনুপম আদর্শ।

*নবীজির (সাঃ) বৈবাহিক জীবন নিয়ে যে সমালোচনা সে বিষয়ে পর্যালোচনা :

ইসলাম বিদ্বেষীরা নবীজির (সাঃ) নামে নানারকম কুৎসা রটনা ও নবীজির (সাঃ) বিয়ে কে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করেছে। আয়িশাকে (রাঃ)অল্প বয়সে বিয়ে করা, সাথে এতজন স্ত্রী রাখা এসব বিষয় নিয়ে তারা নবীজিকে (সাঃ) অপবাদ দেয়। তাই রাসূলুল্লাহর (সাঃ) জীবন সম্পর্কে মুসলিমদের সঠিক ধারণা রাখা অত্যন্ত জরুরি।

রাসুলের (সাঃ) জীবনকালে মক্কার অবস্থা খুবই ভয়াবহ ছিল। নারী পুরুষের মাঝে অবাদ মেলামেশা, অবৈধ সম্পর্ক ব্যভিচার এসব ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত একটি হাদিসে জানা যায় যে -সেই সময় নারী পুরুষের মাঝে চার ধরনের সম্পর্ক প্রচলিত ছিল। একটি ছিল এখনকার সাধারণ বিয়ের মত। দ্বিতীয় প্রকার ছিল পতিতবৃত্তি। মক্কার কিছু বাড়ির উপর বিশেষ ধরনের

চিহ্ন থাকতো এগুলো ছিল পতিতালয়। তৃতীয় সম্পর্ক ছিল এমন একজন নারী ১০ জন পুরুষের সাথে এক এক করে শয্যাশায়ী হবে। এরপর গর্ভধারণ করলে, তার ইচ্ছামত তাদের যেকোনো একজনের দিকে নির্দেশ করতে এবং সেই লোককেই বাচ্চার সমস্ত দায় দায়িত্ব গ্রহণ করে নিতে হবে। চতুর্থ ধরনের সম্পর্ক ছিল এমন একজন লোক তার স্ত্রীকে অভিজাত ঘরের লোকের সাথে যিনা করার জন্য পাঠাবে যাতে করে তাদের সন্তান উন্নত বংশের হয়। এরকম নীতিবর্জিত সমাজে বসবাস করেও নবীজি (সাঃ) জীবনে নারীঘটিত কোন সম্পর্কে জড়ানো। তিনি সৎ ও পবিত্র হিসেবে পরিচিত ছিলেন।

২৫ বছর পর্যন্ত তিনি ছিলেন কুমার। এই বয়সে এসে তিনি বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। রাসূল (সাঃ) উচ্চ বংশের যুবক ছিলেন। তিনি (সাঃ) চাইলেই মক্কার যে কোন নারীকে বিয়ে করতে পারতেন। নবীজির (সাঃ) থেকে ছোট অল্প বয়সী যেকোনো তরুণীকে বিয়ে করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি, তিনি এমন একজনকে বিয়ে করেছিলেন যিনি ছিলেন তার (সাঃ) থেকে ১৫ বছরের বড় শুধু তাই নয় তিনি ছিলেন একজন বিধবা ও তালাকপ্রাপ্ত মহিলা। সাধারণত একজন পুরুষ যুবক থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত নারীদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে থাকে। এ বয়সটাতে পুরুষের চাহিদা থাকে বেশি। কিন্তু রাসুল (সাঃ) তার প্রথম স্ত্রী খাদিজার (রাঃ) সাথে পচিঁশ বছর সংসার করেছেন। তিনি বেঁচে থাকা অবস্থায় আর কোন স্ত্রী গ্রহণ করেননি বরং খাদিজাকে (রাঃ) নিয়ে অত্যন্ত খুশি ছিলেন। নবীজি নারীদের ব্যাপারে দুর্বল বা তিনি নারী-লোভী ছিলেন,এ ধরনের কথা শুধু মিথ্যাচারই নয় বরং বানোয়াট ও ভিত্তিহীন।

খাদিজা (রাঃ) মারা যাওয়ার দুই তিন বছর পর পর্যন্ত নবীজি (সাঃ) একা জীবন যাপন করেছেন। এরপর সাওদাকে (রাঃ) বিয়ে করেন। তিনিও ছিলেন বিধবা এবং তারও পূর্বের ঘরের সন্তান ছিল। তিনিও নবীজির থেকে বয়সে বড় ছিলেন।

নবীজি (সাঃ) পরবর্তীতে আরো কয়েকটি বিয়ে করেন। নবীজির একাধিক বিয়েগুলো ছিল সমাজসংস্কার, দাওয়াতি কৌশল, মানবিক দায়িত্ব পালনের অসাধারণ উদাহরণ।

নবীজি (সাঃ) এর অধিক সংখ্যক স্ত্রী গ্রহণের পিছনে ছিল নবুওয়াতী কার্যক্রমের মহান উদ্দেশ্য যা ছিল বিয়ে থেকে অনেক মহান। রাসুলুল্লাহর (সাঃ) জীবনের মিশন ছিল ইসলামের প্রচার, প্রসার ঘটানো,ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। নিজের খেয়াল খুশি বা চাহিদা মেটানোর জন্য তিনি (সাঃ) কোন কাজ করেননি।

নিজের বৈবাহিক জীবনের যেসব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সেগুলোও কেবলমাত্র ইসলামের কথা চিন্তা করেই নিয়েছেন।

নবীজির (সাঃ) স্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ ছিলেন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও গোত্রীয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবারের সদস্য তাদের মাধ্যমে ইসলাম সহজেই বিভিন্ন গোষ্ঠীতে পৌঁছেছে।যেমন -জুয়াইরিয়্যা কে বিয়ে করার ফলে বনু মুসতালিক গোত্রের সবাই ইসলাম কবুল করেন।

আয়িশা (রাঃ) ও হাফসা (রাঃ) এর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার মাধ্যমে সাহাবীদের সাথে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ ও মজবুত হয়েছিল। নবীজি (সাঃ) নিজের দুই কন্যাকে উসমানের (রাঃ) সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। আলী ইবন আবি তালিবের (রাঃ) সাথে নবীজি (সাঃ) ফাতিমার (রাঃ) বিয়ে দেন। এই বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহর দ্বীনের স্বার্থে। চারজন সম্মানিত ব্যক্তির সঙ্গে একটি শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলা। যারা ইসলামের চরম দুর্যোগপূর্ণ সময়ে অসামান্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছিলেন।

রাসূলের (সাঃ) একাধিক বিয়ের আরেকটি কারণ ছিল দ্বীনের শিক্ষার পরিপূর্ণতা। রাসুল (সাঃ) আমীর হিসেবে কেমন ছিলেন, একজন নেতা হিসেবে কেমন ছিলেন, যুদ্ধক্ষেত্রে কেমন ছিলেন, দেশ পরিচালনায় কেমন ছিলেন, প্রভৃতি বিষয়গুলো বর্ণনার জন্য শত শত সাহাবী ছিলেন। কিন্তু নবীজির পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানতেন এমন সাহাবীর সংখ্যা খুব কম। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) এর সন্তানদের

মধ্যে একজন বাদে সবাই মারা গেছে। নবীজির পারিবারিক তা বৈবাহিক জীবন সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা তার স্ত্রীদের থেকেই পাওয়া যায়।

নবীজির (সাঃ) একাধিক স্ত্রী থাকার কারণে অনেক সুবিধা হয়েছে। যেমন একজনের পক্ষে সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় মনে রাখা খুব কঠিন ছিল। কয়েকজন স্ত্রী থাকার কারণে একজন ভুলে গেলেও অন্য কেউ সেটা স্মরণ করে দিবে। এছাড়া একটা মাত্র উৎস হলে দুর্বল বলে প্রমাণ করে দিতে পারলেই সব হাদিস বাতিল করে দেওয়া যেত। সেক্ষেত্রে নবীর (সাঃ) পারিবারিক, বৈবাহিক জীবন জানা অসম্ভব হয়ে যেত। আর রাসুলকে (সাঃ) পরিপূর্ণভাবে অনুসরণ করার জন্য রাসুলের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে জানা ও মানা প্রত্যেক মুসলিমের কর্তব্য।

কাফিররা আবু হুরায়রা (রাঃ) কে ভুল প্রমাণ করার জন্য অনেক বার আক্রমণ করেছে। কারণ আবু হুরায়রাকে (রাঃ) বাতিল প্রমাণ করতে পারলে তার বর্ণিত পাঁচ হাজার হাদিস প্রশ্নবিদ্ধ করে দেওয়া সম্ভব। রাসূলের (সাঃ) স্ত্রী থাকার কারণে তাদের থেকে বর্ণিত হাদিসগুলোর সত্যতা আরো জোরালো হয়েছে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কীভাবে খেতেন,ঘুমাতেন, বসতেন, স্ত্রীদের সাথে কীভাবে   রাত কাটাতেন, কীভাবে আচরণ করতেন, দাসদের সাথে কেমন ব্যবহার করতেন, এসব বিষয়ের হাদিসগুলো উম্মুল মুমিনীনদের মাধ্যমে জানা যায়। পরিবারে রাসূল (সাঃ) কিরূপ আচরণ করেছেন সেটা জানার গুরুত্ব অপরিহার্য। আর সেটা একমাত্র স্ত্রীদের পক্ষেই জানা সম্ভভ।

এ বিশাল পরিমাণ জ্ঞানের উৎস তার স্ত্রীদের থেকে পাওয়া যায়।

মুসলিম সমাজের মহিলাদের নিকট ইসলামের শিক্ষা- দীক্ষা ও নবী (সাঃ) এর সুন্নাহ পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারে উম্মাহাতুল মুমিনীনের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাদের মধ্যে যারা দীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন এ ব্যাপারে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আয়িশা (রাঃ) নবী (সাঃ) এর কথা ও কাজ সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়া তাআলা রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) কুরআনের জীবন্ত প্রমাণ হিসেবে প্রেরণ করেছেন। নবীজির (সাঃ) মাধ্যমে ইসলামের বাস্তব প্রয়োগ শিখিয়েছেন। তাই নবীজির (সাঃ) সুন্নাহ সবার কাছে পৌঁছানো অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যই আল্লাহ তাআলা রাসূলকে (সাঃ) বিয়ের সাধারণ নিয়ম থেকে অব্যাহতি দিয়ে চারজন বা কম সংখ্যক স্ত্রীর বদলে অধিক স্ত্রী দান করেছেন।

রাসূলের যে দুটি বিয়ে নিয়ে সবচেয়ে বেশি সমালোচনা হয়, সে দুটি হ্যালো আয়িশা (রাঃ) ও যাইনাব বিনতে জাহাশের (রাঃ) সাথে বিয়ে। যাইনাব বিনতে জাহাশের (রাঃ) রাসুলের (সাঃ) বিয়ে নিয়ে প্রশ্ন তোলার কারণ যাইনাব (রাঃ) নবীজির পালক পুত্র যায়িদের স্ত্রী। ওদিকে আয়িশার (রাঃ) সাথে নবীজির বিয়ে হয় তখন আয়িশার (রাঃ) বয়স ছিল ছয় বছর। এ বিয়ে পূর্ণতা লাভ করে যখন আয়িশার (রাঃ) বয়স নয় বছর হয়। এ দুটি বিয়েই আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি আদেশপ্রাপ্ত ছিল। রাসূলের (সাঃ) অন্য কোন বিয়ে ওহীর মাধ্যমে নির্দেশিত ছিল না, শুধুমাত্র এ দুটি বিয়ে ছিল ব্যতিক্রম।

যাইনাব বিনতে জাহাশ (রাঃ) এর সাথে বিয়ের কারণে জাহেলিয়াত যুগের এক প্রথার মূল উৎপাটিত হয়েছিল। আল্লাহ সুবাহানাহু তাআলা পবিত্র আল কুরআনে সূরা আহযাবে যাইনাবকে (রাঃ) বিয়ে করার জন্য আয়াত নাযিল করেন।

আয়িশার (রাঃ) সাথে বিয়ের নির্দেশ ওহীর মাধ্যমে এসেছিল। রাসুল (সাঃ) স্বপ্নে এই নির্দেশ প্রাপ্ত হন। সহীহ বুখারীতে এই স্বপ্নের কথা উল্লেখ্য আছে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আয়িশাকে (রাঃ) বলেছেন- “জিবরীল আমার কাছে এলেন, আমি দেখতে পেলাম তুমি একটি সিল্কের কাপড়ে জড়ানো। যখন আমি কাপড়টি সরিয়ে তোমাকে দেখলাম, জিবরীল বললেন, এই হলো তোমার স্ত্রী দুনিয়ায় এবং আখিরাতে।” নবীজি এই স্বপ্ন দুইবার দেখেন। নবী-রাসূলদের স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে ওয়াহী।

বিয়ের সময় আয়িশা (রাঃ) ছিলেন অল্প বয়সী। তবে সংস্কৃতি ও সমাজে এটি ছিল স্বাভাবিক। নবীজির (সাঃ) সাথে আয়িশার (রাঃ) বিয়ে ঐতিহাসিক, সামাজিক, ধর্মীয় দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ও সম্মানজনক সম্পর্ক ছিল। ঐ সময়ে আরব সমাজে মেয়েরা শারীরিক ও মানুসিকভাবে দ্রুত পরিপক্ক হতো। শুধু ইসলামে নয় বরং তৎকালীন সব সংস্কৃতিতেই বিয়ের বয়স এখনকার মতো নির্দিষ্ট ছিল না। আয়িশার (রাঃ) বিয়ে শারীরিক ও সামাজিকভাবে উপযুক্ত সময়ে হয়েছিল।
যারা এই বিয়েকে নিয়ে সমালোচনা করে তারা ইতিহাস,কালপ্রবাহ, প্রাসঙ্গিকতা উপেক্ষা করে আধুনিক মানদন্ড দিয়ে ১৪০০ বছর আগের সমাজকে   বিচার করে যা বুদ্ধিভিত্তিকভাবে অনৈতিক ও ভুল।

রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে আয়িশার (রাঃ) বিয়ে হওয়ার মধ্য দিয়ে আল্লাহ তাআ'লা মুসলিমদের উপর অনেক বিশাল নেয়ামত দান করেছেন। যারা আয়িশার (রাঃ) অল্প বয়সে বিয়ে নিয়ে সংশয় পোষণ করে তারা তো বুঝতেই পারে না যে এ বিয়ে না হলে মুসলিম উম্মাহর উপর কি দুর্যোগ আপতিত হতো। আয়িশা (রাঃ) ছিলেন প্রচন্ড মেধাশক্তির অধিকারী, একজন আলিমা, অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ও অনুসন্ধানী প্রকৃতির।আয়িশার (রাঃ) বয়স কম হওয়ায় রাসূলের (সাঃ) সাথে তার সম্পর্ক বন্ধুসুলভ ছিল। তাই তিনি নবীজিকে (সাঃ) নানা ধরনের প্রশ্ন করতে পারতেন। কিন্তু অন্যান্য সাহাবীরা নবীজির (সাঃ) শ্রদ্ধা ও সম্মান থেকে এভাবে প্রশ্ন করতে পারতেন না। তাই এমন একজনের প্রয়োজন অবশ্যই ছিল যে নবীজির (সাঃ) কাছে তার বক্তব্য গুলো নিয়ে জানতে চাইতে পারেন।

আমার ইবন আস (রাঃ) বলেন- "আমি নবীজির (সাঃ) সাথে বছরের পর বছর একসাথে থেকেছি। কিন্তু তোমরা যদি আমাকে জিজ্ঞেস করো রাসূলুল্লাহ (সাঃ) দেখতে কেমন ছিলেন, আমি বলতে পারবো না। কারণ তার প্রতি প্রচন্ড ভালবাসা, শ্রদ্ধার কারণে আমি কখনো তার (সাঃ) চোখের দিকে সরাসরি তাকায়নি।"
যেখানে সম্মান ও শ্রদ্ধার কারণে সাহাবীরা নবীজির (সাঃ) দিকে তাকানোর সাহস পর্যন্ত পেতেন না। সেখানে আয়িশা (রাঃ) খুব খোলাখুলি ভাবে নবীজির (সাঃ) সাথে আলোচনা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। ফলে তিনি অনেক কিছু শিখতে

পেরেছিলেন। যার কারনে তিনি সবচেয়ে বেশি হাদিস বর্ণনা কারীদের মধ্যে অন্যতম এবং তিনি একজন বড় আলিমাও। ফিকহের গ্রন্থ সমূহে আয়িশার (রাঃ) নাম উল্লেখ রয়েছে।

এখান থেকে অনুধাবন করা যায় নবীজির (সাঃ) সাথে আয়িশার (রাঃ) বিয়ে মুসলিম উম্মাহর জন্য কত বড় নিয়ামত।

আয়েশা (রাঃ) নবীজির (সাঃ) একমাত্র কুমারী স্ত্রী ছিলেন। এছাড়া বাকি সব স্ত্রী বিধবা কিংবা তালাকপ্রাপ্ত ছিলেন।

নবীজি (সাঃ) যে বিয়েগুলো করেছেন তার মধ্যে আরেকটি বিয়ে হলো উম্মে হাবিবার (রাঃ) সাথে বিয়ে। তিনি ছিলেন আবু সুফিয়ানের কন্যা। তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে আবিসিনিয়া হিজরত করেন। সেখানে যাওয়ার পর তার স্বামী ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে খ্রিস্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু উম্মে হাবিবা (রাঃ) ইসলামের উপর অটল ছিলেন। যার কারণে তাকে অনেক দুঃখ কষ্টের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়েছে। তার স্বামী মারা যাবার পর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নাজ্জাশীর কাছে চিঠি লিখে পাঠান। সে চিঠিতে লিখা ছিল নাজ্জাশী যেন নবীজির (সাঃ) সাথে উম্মে হাবিবার (রাঃ) বিয়ের ব্যবস্থা করেন। তিনি হাজারো মাইল দূরে থাকা সত্ত্বেও নবীজি (সাঃ) তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তিনি (সাঃ) এ বিয়ে করেছিলেন সহানুভূতি থেকে। তার সকল দায়ভার নিজের কাছে তুলে নেন। আরেকটি কারণ ছিল ইসলামের সবচেয়ে বড় শত্রু আবু সুফিয়ানকে ইসলামের ছায়াতলে নিয়ে আসা। ইসলামের গুরুতর শত্রু হওয়া সত্ত্বেও নবীজির (সাঃ) সাথে নিজের মেয়ের বিয়ের কথা শুনে খুব খুশি হয়েছিলেন। উনি বলেন যে, 'মুহাম্মদের চেয়ে উত্তম আর কে আছে'। আসলে রাসূলুল্লাহর (সাঃ) সাথে তার বিরোধ ছিল আদর্শিক,দ্বীন নিয়ে দ্বন্দ্ব। কিন্তু মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন অনেক উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন বংশের অধিকারী। তাই তিনি তার মত কম মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির মেয়েকে বিয়ে করায় তার অন্তর নরম হয়ে যায়।

নবীজির (সাঃ) আরেকটি বিয়ে ছিল উম্মে সালামার (রাঃ) সাথে বিয়ে। তার স্বামী আবু সালামা (রাঃ) মারা যাওয়ার পর নবীজি তাকে বিয়ে করেন। মৃত সাহাবীদের

স্ত্রীদেরকে বিয়ে করার মাধ্যমে তাদের দেখাশোনার ভার গ্রহণ করেন। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন মুসলিম উম্মাহর পিতা, তত্ত্বাবধায়ক। সাহাবীদের সাথে রক্তের সম্পর্ক না থাকলেও তিনি ছিলেন তাদের সবচেয়ে আপনজন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাদের যে কোন দুঃখ, কষ্টে, প্রয়োজনে, দুঃসময়ে সব সময় তাদের পাশে থেকেছেন।

*উপসংহার :

নবীজির (সাঃ) বৈবাহিক জীবন আমাদের শেখায় কীভাবে একজন পুরুষ নারীর প্রতি দয়াশীল, সম্মানজনক ও দায়িত্বশীল হতে পারে। তার (সাঃ) জীবন আদর্শ অনুসরণ করে আমরা আমাদের পারিবারিক জীবনকে সুন্দর, ভারসাম্যপূর্ণ ও কল্যাণময় করে তুলতে পারি। নবীজির (সাঃ) বৈবাহিক জীবন শুধু একাধিক বিয়ের ঘটনা নয় বরং তা ছিল মানবিকতা, ন্যায় বিচার, নারীর অধিকার ও পারিবারিক শান্তির এক অতুলনীয় পাঠশালা।

**তথ্যসূত্র :

১.সীরাহ মুহাম্মদ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম
—রেইনড্রপস প্রকাশিত।
২.নবীজির সংসার
—-লেখক -শাইখ সালেহ আল-মুনজিদ
৩.সীরাহ- আর রাহীকুল মাখতুম।